সুধাংশু পাত্র

মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো

2298

মনের মত
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্‌পো

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৮৯
ডিসেম্বর ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬
—মে ১৯৮৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
পরেশ নাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১৫ টাকা 20/-
Rupees fifteen only.

ছোট ভাই হিমাংশুর

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমরপ্রতিভা
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
জীবজগতের বিস্ময়
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
আজকের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিজ্ঞানের সহজ পাঠ
মহাসাগরের মহাবিস্ময়
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা
পশুপাখী ও পতঙ্গদের গপ্পো

অধিকাংশ গপ্পো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যুগান্তকারী
আবিষ্কারগুলিকে অবলম্বন করে লিখিত হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রাণী অঙ্গের স্বাভাবিক পুনর্গঠন

গল্পের সেরা রাজার গল্প। আবার রাজার সেরা রাবণ রাজা। বাপরে বাপ, কী ভয়ঙ্কর সেই রাজা! দশমুণ্ড কুড়ি হাত। এমন যে রাবণ রাজা তাঁকে নিয়ে শুরু করা যাক গপ্‌পো। মহাকবির বর্ণনায় দেখি, মাথা কাটা গেলে রাবণ রাজার কিচ্ছু অসুবিধে হত না। একটা, দুটো, তিনটে, এমনকি দশ দশটা মাথা খোয়া গেলেও মাথাগুলো টুক টুক করে এসে জোড়া লেগে যেত অথবা নতুন করে মাথা গজিয়ে উঠত। তাইতো তাঁকে বধ করতে গিয়ে বেচারা শ্রীরামচন্দ্রকে কী দুর্ভোগটাই না ভোগ করতে হয়েছিল!

কেবল রামায়ণে নয়, অপরাপর দেশের পুরাণগুলিতেও অনুরূপ মাথা জোড়া লাগার কাহিনী আছে।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো, বিজ্ঞানের গল্পে পুরাণ, মহাকবি, এঁদের নিয়ে এত টানাটানি কেন? মহাকবিরা কী বিজ্ঞানী ছিলেন?

তার উত্তরে জানাই, বিজ্ঞানী ও কবি উভয়েই সত্যদ্রষ্টা। কবির কল্পনার মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকে। তবে সেকালে মহাকবিরা প্রাণি-জগতের কোন বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাবণ রাজাদের কল্পনা করেছিলেন অথবা রাবণ রাজার সত্য সত্যই মাথা জোড়া লাগত কি না সে কথা আজ জোর করে কিছু বলার উপায় নেই। অন্যদিকে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে, কাটা মুণ্ড জোড়া লাগতে পারে কিংবা কোন অঙ্গ কাটা গেলে পুনরায় গাছ-গাছড়ার মত সেটি নতুন করে গজিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দেখেছো কতকগুলো ইতর প্রাণীকে?

আগে টিকটিকির কথাটা ধরা যাক। তোমরা অনেকেই টিকটিকির লেজ খসে যাওয়ার ব্যাপারটা জানো। কিন্তু লক্ষ্য করেছো কি, টিকটিকির লেজ খসে গেলে পুনরায় লেজ গজায় ?

কেবল টিকটিকি নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। কাঁকড়া কিংবা চিংড়ি মাছের দাড়া ভেঙ্গে গেলে নতুন দাড়া গজায়। আরও দেখা গেছে, কাঁকড়ার একপাশের দাড়া সমেত কিছু অংশ কেটে বাদ দিলেও পুনর্গঠিত হয় তাদের অঙ্গ। কেঁচোর দেহ থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে দাও, কিছুদিন পরে দেখবে আপনা হতেই গঠন করে নিয়েছে তার শরীর। এমন অনেক জাতের শামুক আছে, যাদের মাথা কেটে দিলেও মাথা গজায়। ফড়িং-এর লেজও এই জাতীয়।

তাহলে মহাকবি কী প্রাণিজগতের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে সেদিন রাবণ রাজার কল্পনা করেছিলেন ?

এবার আমাদের গপ্‌পের হল শুরু। মহাকবিদের কথা বলতে পারি না, তবে প্রাণি-জগতের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বহুদিন থেকে বহু বিজ্ঞানীকে ভাবিয়ে এসেছিল! ছোট ছোট প্রাণীর উপর নানাভাবে পরীক্ষা চালাতেন তাঁরা। টিকটিকি, গিরগিটি, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণী ছাড়া অন্যান্য কোন্ কোন শ্রেণীর প্রাণী স্বাভাবিকভাবে অঙ্গ পুনর্গঠনের ক্ষমতা রাখে, তা নির্ণয় করার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু জীববিজ্ঞানী আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কথা। ট্রেম্বলি নামে ছিলেন এক জীববিজ্ঞানী। একবার তাঁর মাথায় কী যেন সব খেলায় চাপল। যেখানে পেতেন যত ছোট ছোট প্রাণী, তাদের ধরে এনে সযত্নে প্রতিপালন করতেন এবং লক্ষ্য করতেন অঙ্গসংস্থানের বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় কোন কোন প্রাণীর একটি অঙ্গকে সূক্ষ্ম ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলে পুনরায় তাকে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করতেন অথবা প্রাণীটির নতুন করে অঙ্গ গজায় কিনা পরীক্ষা করতেন।

একবার একটি হাইড্রার উপর চালালেন তাঁর পরীক্ষা। কী ভেবে একদিন একটি হাইড্রাকে আড়াআড়িভাবে কেটে দুভাগে ভাগ করে ফেললেন? তারপর দুটি খণ্ড জোড়া দিয়ে রেখে দিলেন উপযুক্ত পরিবেশে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। হাইড্রাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন ট্রেম্বলি, মহাভারতের জরাসন্ধ রাজার মত হাইড্রাটার কাটা অঙ্গ জোড়া লেগে গেছে।

ট্রেম্বলি হাইড্রাটাকে ফেলে দিলেন না। বরং আরও নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাকে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করলেন। হাইড্রাকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন চললো তাঁর পরীক্ষা। অবশেষে ঐ জোড়ালাগা হাইড্রা থেকে যখন নতুন হাইড্রা জন্ম নিল তখনই তিনি বিশ্বাস করলেন, ওদের দেহকে কেটে সদ্য সদ্য জোড়া দিলে জোড়া লেগে যায়। অথচ প্রাণীটির কোন ক্ষতি হয় না।

ট্রেম্বলি তাঁর আবিষ্কারের কথাটা প্রচার করলেন বিজ্ঞানী মহলে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহজে মেনে নিতে পারলেন না তাঁর কথা। সেই যে ধারণা, জীবকে কেটে ফেললে কী সে বেঁচে উঠতে পারে? এর চেয়ে ট্রেম্বলি যদি বলতেন, তিনি একটা আরশোলাকে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে দেখেছেন—তা হলে না হয় একটু ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ থাকতো।

বিজ্ঞানীদের সবাই একরকম তেড়ে এলেন। ভাবলেন, ট্রেম্বলির মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। পরীক্ষাটি হাতে নাতে করে দেখতেও কারও প্রবৃত্তি হল না। পাগলের প্রলাপ ভেবে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ। আর বেচারা ট্রেম্বলি? ঘরের বাহিরে মুখ দেখানোই তাঁর দায় হয়ে উঠল।

কতদিন কেটে গেল। ট্রেম্বলির কথাটা ততদিনে অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ভোলেনি তাঁর কথা। তার নীতি অনুযায়ী, তার রাজ্যে যেখানে যত সূক্ষ্ম তরঙ্গই উত্থিত হোক না কেন

তাকে পরম মমতাভরে মহামূল্য সম্পদের মত জোর করে আঁকড়ে রাখে। তাই পরবর্তীকালে ট্রেম্বলির সেই পরীক্ষাটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে ছিলেন রেমার নামে জনৈক জীববিদ্যাবিশারদ। তিনি প্রথমে বেশ কয়েকটা হাইড্রাকে কেটে দেখলেন। পরিশেষে নিঃসন্দেহ হয়ে হাইড্রা ছাড়া অন্য কোন নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে উক্ত সত্য প্রযোজ্য কি না, সে বিষয়ে গবেষণায় হলেন প্রবৃত্ত।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ। বিজ্ঞান জগতে রেমার আনলেন এক মহা-আলোড়ন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হাইড্রার কাটা অঙ্গ কেবল জোড়া লাগে না; এমন অনেক প্রাণী আছে—যাদের মাথা কেটে ফেললেও পুনরায় মাথা গজিয়ে উঠে। বিজ্ঞানীরা এবার রীতিমত চমকে উঠলেন রেমারের কথা শুনে। ভুলে গেলেন রেমারকে পাগল বলে উপহাস করতে।

রেমার প্ল্যানেরিয়া নামে ছোট্ট এক কৃমির উপর পরীক্ষা চালিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উপরোক্ত সত্যটিকে। ঐ প্ল্যানেরিয়ারা নানা জাতের হয়ে থাকে। স্বাধীনজীবী চ্যাপ্টা ধরনের। রঙটা ঈষৎ বাদামী এবং লম্বায় দু-এক সেন্টিমিটারের মত। জলাভূমিতে পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে এরা। ওদের মাথা আছে এবং মাথার উপর দুটি চোখও আছে। কিন্তু মুখ গহ্বরটা মাথায় নেই। সেটি অবস্থান করছে পেটের ঠিক মাঝখানেই। অর্থাৎ মাথা না থাকলেও খাদ্যগ্রহণে ওদের কোনও অসুবিধা হয় না।

রেমার তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী একদিন একটি প্ল্যানেরিয়াকে ধরে এনে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাথাটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংরক্ষণ করেছিলেন একটি জলপূর্ণ টবে। পরের দিনই দেখতে পেলেন মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ধড়টার উপরে যেখানে মাথা ছিল সেখানে সৃষ্টি হয়েছে পাতলা পর্দার মত এবং ঐ ধড়টাতে তখনও প্রকাশ পাচ্ছে জীবনের লক্ষণ।

কৌতূহলী রেমার আরও যত্ন নিলেন মাথাহীন প্ল্যানেরিয়াটির প্রতি। মাত্র একটি সপ্তাহ পরে দেখলেন, পর্দার উপর সুন্দর একটি ছোট্ট গুটি। আরও কৌতূহলী এবং আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন রেমার। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন প্ল্যানেরিয়ার শেষ পরিণতি জানার জন্য।

মাত্র চারটি সপ্তাহও গত হল না, রেমারের জলপূর্ণ টবে ঘুরে বেড়াতে লাগল প্ল্যানেরিয়ার কবন্ধের বদলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেরিয়া। শরীরে এতটুকু খুঁত কোথাও নেই। একেবারে সেই আগেকার প্ল্যানেরিয়া। কে বলবে একদিন ওর মাথা কাটা গেছিল? রামায়ণের যেন সেই রাবণ রাজা!

রেমারের মনে তখনই একটা প্রশ্ন এল, প্ল্যানেরিয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটল মানুষের বেলায় তা ঘটেনা কেন? মাথা তো দূরের কথা, একটা আঙ্গুল কেটে গেলেও আঙ্গুল স্বাভাবিকভাবে পুনর্গঠিত হয় না। কেন, কেন, কেন?

বহু চেষ্টা করেও রেমার সেদিন এই ঘটনার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। শুধু তাঁর পরীক্ষাটিই প্রভাবিত করল অপরাপর জীববিজ্ঞানীদের। অনেকদিন ধরে অনেকে মাথা ঘামিয়ে ছিলেন এ বিষয়ে। সুদীর্ঘকাল গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন, প্ল্যানেরিয়ার দেহটা প্যারেনকাইমা নামে একজাতীয় কোষ দ্বারা গঠিত। অপরদিকে ঐ কোষরা আবার ওদের দেহে সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান করছে না। একরকম আলতোভাবে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঠেকে আছে। প্যারেনকাইমা ছাড়াও একধরনের কোষ আছে প্ল্যানেরিয়াদের দেহে। বিজ্ঞানীরা শেষোক্ত কোষগুলির নামকরণ করেছেন পুনর্গঠন কোষ বা রিজেনারেশন সেল। এরা দেহের কোন বিশেষ অঙ্গ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট হয়নি। অথচ, দেহের প্রয়োজনীয় বিশেষ অঙ্গের রূপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

পুনর্গঠন কোষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা দেখতে অনেকটা গোলাকার

এবং ওর নিউক্লিয়াসটি আনুপাতিকভাবে বেশ বড়। একমাত্র ঐ কোষগুলিই দেহের কোন অংশকে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা রাখে বলেই এই ধরনের নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্ল্যানেরিয়ার প্যারেনকাইমা কোষগুলি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ না থাকায় তার পুনর্গঠন কোষগুলি প্যারেনকাইমা কোষগুলির ভেতর দিয়ে অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে এবং যে অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে সেই অঙ্গকে পুনর্গঠিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

আরও মজার কথা, সব প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে বিজ্ঞানীরা পুনর্গঠন কোষের সন্ধান পেয়েছেন। তবে তাঁরা দেখেছেন, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঐ কোষগুলি প্রথম থেকেই বিশেষ বিশেষ অঙ্গগঠনের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। প্ল্যানেরিয়াদের ক্ষেত্রে একেবারে যে ব্যয়িত হয় না এমন নয়। তবে উদ্বৃত্ত থাকে যথেষ্ট সংখ্যক। আর উন্নত জীবগোষ্ঠীর বেলায় উদ্বৃত্ত থাকে না বললেই চলে। টিকটিকির লেজের দিকটায় উদ্বৃত্ত পুনর্গঠন কোষের পরিমাণ বেশি থাকায় লেজটাকেই পুনর্গঠিত করার ক্ষমতা রাখে। মাথা ও পেটের দিকটায় অভাব হেতু এই দুই অংশ সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হয় না।

কেঁচোর বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য। যখনই তার দেহের কোন অংশ কাটা যায় তখনই দলে দলে পুনর্গঠন কোষ কাটা অংশের দিকে ধাবিত হয় এবং প্রথমে একটি ছোট্ট গুটি গঠন করে নেয়। তারপর সেই গুটির মধ্যেই চলতে থাকে কোষ বিভাজন। অবশেষে বিভাজন হতে হতে একসময় উৎপন্ন করে পূর্ণাঙ্গ দেহ।

বিজ্ঞানীরা আরও স্থির করেছেন, নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদের মধ্যেই অঙ্গ পুনর্গঠন করার ক্ষমতা প্রবল। তারপর ধীরে ধীরে যতই উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণীদের পরীক্ষা করা যাবে, ততই দেখা যাবে উক্ত ক্ষমতা কম হতে হতে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

তবে উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে যে এই ক্ষমতা একেবারেই নেই এমন কথা ঠিকমত বলা যায় না। মানুষের মধ্যেও দেখা গেছে,

দেহের কোন জায়গা কেটে গেলে কিংবা ছিঁড়ে গেলে আপনা হতেই পুনর্গঠিত হয়ে যায়। দেহের অভ্যন্তরে কোন অংশের হাড় ভেঙ্গে গেলে কিছু সময় অন্তে সেটি পুনরায় জোড়া লাগে। অপর পক্ষে কোন পেশী থেকে কিছুটা মাংস কেটে বার করে আনলেও পেশী পুনর্গঠিত হয়। কেটে ফেললেও নখ চুলকে গজাতে দেখি। কিন্তু রাবণ রাজার মত অথবা জলাশয়ের সেই কীট প্ল্যানেরিয়ামের মত আস্ত মাথাটা গজিয়ে উঠে না। বিজ্ঞান এমন অসম্ভবকে কোনকালে সম্ভব করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আছে যথেষ্ট সন্দেহ। তবে তোমরা বড় হলে পুনর্গঠন কোষগুলিকে নিয়ে ভালভাবে গবেষণা করতে পারো। ঐ কোষগুলি সম্বন্ধে এখনও বহু তথ্য অজ্ঞাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেহের কোন অংশ কেটে বা ছিঁড়ে গেলে তাকে পুনর্গঠন করার জন্য মস্তিষ্কের ভূমিকাই সর্বাধিক। দেহে এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র আছে। তার কাজ হচ্ছে, দেহের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে—সে খবর মনের অগোচরে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেওয়া। করণীয় যাবতীয় নির্দেশও সে বহন করে নিয়ে আসে শরীরের প্রয়োজনীয় অংশে। জেগে থাকলে ঘুমালে অথবা সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়লেও স্নায়ুগুলি ঠিকভাবে কাজ করে যায়। বিরাম তার নেই। যতকাল মানুষ বেঁচে থাকে ততকাল সেগুলি থাকে সক্রিয় এবং নিরলসভাবে কাজ করে চলে। আমরা কর্মবিরতি পালন করলেও তারা করে না। ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রকে বলা হয় সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন খবর মস্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও একধরনের স্নায়ুতন্ত্র কাজ করে। এদের নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। আমাদের দেহের প্রতিটি স্থানে যে সচেতনতা, তার মূলে আছে ঐ স্নায়ুতন্ত্র। এরা দুরকমের কোষ দিয়ে গঠিত—নিউরোন কোষ এবং গ্লাইয়াল কোষ।

নিউরোন কোষ অতি ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় কয়েক সহস্র। একটি নিউরোনের বহু শাখা প্রশাখাও আছে এবং সেই শাখা প্রশাখার দ্বারা একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। উদ্ভিদের প্রধান মূলের মত শাখা প্রশাখাদের মধ্যে একটি দৈর্ঘ্যে বেশ বড় হয়। নাম তার অ্যাক্সন। এর শেষ প্রান্তে আবার এক গুচ্ছ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু। সেই তন্তুগুলিই অপরাপর কোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

'অ্যাক্সন-এর' কার্যাবলী অত্যন্ত চমকপ্রদ। এদের বহিরাবরণী তড়িৎ শক্তির স্পর্শে উদ্দীপ্ত। যে কোন কোষ থেকে যে কোন সঙ্কেত এর মাধ্যমে নিউরোনের শাখা প্রশাখায় এসে হাজির হয়। আর আশ্চর্যের কথা, সঙ্কেত এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই নির্গত হয় এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। এবং ঐ যৌগই নিউরোনকে উত্তেজিত করে। তারপর সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্নায়ুকোষে। আর বিদ্যুৎগতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। শরীরের পঞ্চেন্দ্রিয় —তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—যার সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোগ, তাদের মধ্যেও তৎক্ষণাৎ অনুভূতি জাগে।

সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের অপর কোষ গ্লাইয়াল কোষের ভূমিকা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও নীরব। বড় হয়ে তোমরা এ বিষয়ে গবেষণা করতে পার।

জীবনের উৎস

প্রবল প্রতাপান্বিত কোন এক রাজাকে নিয়ে গল্পের শুরু করা যেতে পারে। রূপকথার সেই রাজা যেন। মন্ত্রী, কোটাল, কত সৈন্য-সামন্ত পাইক-বরকন্দাজ সর্বদা ঘিরে থাকত রাজাকে! মন্ত্রীমশাইর কূটবুদ্ধি, সেনাপতির সাহস ও বীরত্ব, নগর কোটালের তৎপরতা—সব মিলে রাজার রাজত্ব। রাজাদের বৈশিষ্ট্য কেবল ওদের কাছে। অথচ রাজা নিজে বসে বসে রাজভোগ খেয়ে থাকেন। আর হাজার লোক-লস্কর তাঁর ফাইফরমাস খাটে।

মানুষের শরীরটাও একজন রাজা। পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে নাকি দেব-কারিগর বিশ্বকর্মা বিশ্বের সৌন্দর্যরাশির তিল তিল আহরণ করে সৃষ্টি করেছিলেন তিলোত্তমা। তেমনই আমাদের এই যে সুন্দর দেহখানা, সে একক কোন কিছু নয়। কত হাড়, রক্ত, মাংসপেশী, শিরা-উপশিরা এবং কত হরেক রকমের যন্ত্রপাতি দিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক যেন মন্ত্রী আর দেহের অন্যান্য যন্ত্রপাতি তার আজ্ঞাবহ। সুন্দর শরীরটার অভ্যন্তরে নিত্য চলছে কত কাজকর্ম। কত অফিস এবং কত আদালত। তবেই সচল আছে শরীর। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতিরা বেঁকে বসলে রাজার রাজত্ব যেমন শেষ, তেমনই শরীরের যন্ত্রপাতিগুলি কাজ বন্ধ করলে মানবজীবনেরও সমাপ্তি। একমাত্র মানুষ নয় প্রতিটি জীবের বেলায়ও ঐ একই কথা খাটে।

তাহলে এখন প্রশ্ন, এই দেহখানা কী? কোথা থেকে পায় তার যন্ত্রপাতি, হাড়, মাংসপেশী, রক্ত প্রভৃতি? কোন্ অজ্ঞাত কারিগর তাঁর নিপুণ হাতে এদের সংযোজিত করেছিলেন একে একে? জন্মলগ্নে দেহখানা কী সবকিছু লাভ করেছিল?

বিজ্ঞানীরা ভেবে চিন্তে ঠিক করেছেন, কোষ বিভাজনরূপ আশ্চর্য এক প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়েছে সুন্দর এই দেহখানি এবং তার

অগণিত যন্ত্রপাতি। সবার মূলেই আছে কত রকমের কোষ। মানুষ যে শুভ মুহূর্তটিতে মাতৃগর্ভে স্থানলাভ করে—বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ততদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। দেখেছেন মাত্র একটি কোষকে। মাতৃজঠরের অনুকূল পরিবেশে সেই কোষ বিভাজন হতে হতে একদিন পূর্ণাঙ্গ এক শিশুরূপে মায়ের কোল আলোকিত করে। তারপর শিশু বড় হয়। মায়ের কোল থেকে নেমে আসে গৃহের অঙ্গনে। আরও বড় হয়। বাল্যকালে পাথেয় সংগ্রহ করে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীর বিশাল কর্মক্ষেত্রে। পরিশেষে সে পুরাতন হয়ে পড়ে। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী একদিন তাকে বিদায়ও নিতে হয়। কিন্তু রেখে যায় তার চিহ্ন তারই বংশধারার মধ্যে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার নয়।

কিন্তু কী এই জীবন? অতি ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে কেমন করে নিহিত থাকে জীবনের উপাদন? কী আছে সেই কোষের মধ্যে?

বুদ্ধিমান মানুষ সভ্যতার উষালগ্নেই তাকিয়েছিল তার নিজের দিকে। সেই সঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিল বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির দিকেও। সেদিন শ্যামলা ধরণীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি সে। বৃক্ষ-লতা-গুল্মের শ্যামলিমায়, ফুলের সুবাসে, পাখীর ওড়ার ছন্দে, স্থলচর ও জলচর জীবের অদ্ভুত গতিভঙ্গিমায়, সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের সুন্দর চেহারায় কতই না বৈচিত্র্য! বিচার বিশ্লেষণেও প্রবৃত্ত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কোন তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। তাই একরকম উপায় না পেয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা করেছিল স্রষ্টার কল্পনা করে।

তারপর কেটে গেছে কতকাল। মানব-সভ্যতার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জেগে উঠল নানা কৌতূহল। স্রষ্টার খেয়ালকে গুরুত্ব দিয়ে আর বসে রইল না চুপচাপ। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি যত হল ততই সচেষ্ট হল জীবদেহের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে। অনেক দিন পরে টের পেল, কী উদ্ভিদ দেহ, কী জীবদেহ—সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সমন্বয়ে গঠিত। ভেবে নিল, জড় যেমন অতি ক্ষুদ্র

পরমাণুর সমষ্টি, তেমনই জীব ও উদ্ভিদ দেহেরও চরম অন্তিম একটি জিনিস আছে; সেটি কোষ।

মানুষ এইখানে এসে থেমে গেল না। প্রবৃত্ত হল আরও গবেষণায়। সেই সঙ্গে হাজার হাজার প্রশ্ন ভিড় করল তার মনে। কেন ছোলা-গাছে মটর হয় না, আমগাছে ফলে না আমড়া! বাঘের পেটে বাঘ, সাপের পেটে সাপ জন্মায়। কেন বাঘের পেটে সিংহ কিংবা সাপের পেটে কেঁচো জন্মায় না? মানব শিশুর অবয়বখানা কেন মানুষের মত হয়? অপরদিকে দুজন মানুষের মধ্যে বহু মিল থাকলেও কেন এমন আকৃতিগত পার্থক্য? অর্থাৎ সব মানুষ কেন দেখতে এক নয়? সন্তান-সন্ততির মধ্যে পিতামাতার গুণ বা বৈশিষ্ট্য কেন এতখানি বজায় থাকে? কোন্ গুণ আছে ক্ষুদ্রতম ঐ কোষের মধ্যে? এর উপাদানই বা কী? সব কোষের উপাদান কী সমান নয়? অথবা পশুদেহের কোষ এবং মানবদেহের কোষের গঠন কী পৃথক? মানুষের মধ্যেই বা কেন এত পার্থক্য? কেন একজন বুদ্ধিমান, অন্যজন কেন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন? সবাই কেন নিউটন, আইনস্টাইন হতে পারে না?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত হাজার চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা কোষের সঠিক পরিচয় উদঘাটন করতে পারেননি। তাঁরা কেবল এইটুকুই জেনেছিলেন, বিভাজনের ফলে এক কোষ থেকে বহু কোষের উৎপত্তি হয়। আবার নতুন কোষের জন্ম যেমন হয় তেমনই পুরাতন কোষও ধ্বংস হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁরা একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করলেন। বুঝতে পারলেন, জড় পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে যেমন কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস থাকে তেমনটি থাকে কোষের অভ্যন্তরেও। কোষের কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে আবার আছে সূতার মত একটি জালিকা। ঐ জালিকার তাঁরা তখন নামকরণ করলেন ক্রোমাটিন। পরে প্রমাণ করলেন ক্রোমাটিনরা ঘনীভূত হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম উৎপন্ন করে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। মিশার নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী কোষের মধ্যে

এক নতুন ধরনের অম্ল বা অ্যাসিডের আবিষ্কার করেছিলেন। কতকগুলি রাসায়নিক গুণাগুণ ব্যাখ্যা তিনি করলেও জীবনের মূলে উক্ত অ্যাসিডের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। তবে নিউক্লিক অ্যাসিডের আবিষ্কার জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। কোষের কেন্দ্রে তথা নিউক্লিয়াসে উক্ত অ্যাসিড পাওয়া গেছিল বলে নাম হয়েছিল নিউক্লিক অ্যাসিড।

অল্প কিছুকাল পরে ক্যাসল প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানী খাড়া করেছিলেন "জীন হাইপোথেসিস" বা জীন প্রকল্প নামে একটি মতবাদ। তাঁরা জানিয়েছিলেন ক্রোমোজোমস্থিত স্ববিভাজনশীল অতি শক্তিশালী উপাদান "জীন" নামক বস্তুটি হচ্ছে জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক। অর্থাৎ সিংহের শিশু যে সিংহ হয় কিংবা মানব শিশুর অবয়ব যে মানুষের মত হয়, তার মূলে আছে ঐ জীন। তাঁরা আরও প্রমাণ করেছিলেন, ঐ জীন হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ওকে খালি চোখে তো দেখাই যায় না, অধিকন্তু শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও না।

তারপর কেটে গেল বেশ কিছুকাল। জীবনের মূলে ঐ জীন প্রকল্পকেই স্বীকার করে এসেছিলেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডের যে একটা মস্তবড় ভূমিকা আছে তা আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। তবে বিভিন্নস্থানে গবেষণা ছিল অব্যাহত। তদুপরি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে আরও প্রতিভা নিয়োজিত হল।

গ্রিফিথ নামে ছিলেন এক জীবাণুতত্ত্ববিদ। নানা জাতের জীবাণুকে নিয়ে পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর একটা বড় অভ্যাস। একদিন নিউমোকক্কাস নামে একজাতীয় জীবাণুর উপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে সন্ধান লাভ করলেন বিশেষ এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিডের। অবাকও বড় কম হলেন না। বার বার পরীক্ষাটি করে দেখলেন। অবশেষে মন্তব্য করলেন, জীবজগতের বৈশিষ্ট্য এবং

বংশগতির ধারাবাহিকতার মূলে কাজ করে এক ধরনের নিউক্লিক-অ্যাসিডের অণু।

গ্রিফিথের পরীক্ষা প্রভাবিত করল অনেককে। বহুজনে হাতের কাছে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাভেরি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রকাশ করলেন এক বিশেষ তথ্য। তাঁরা গ্রিফিথের মতবাদকে সমর্থন করে বললেন, ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি. এন. এ-ই হচ্ছে বংশগতির মূল উপাদান। আরও জানালেন, এই ডি. এন. এ. অণুর গঠন অত্যন্ত জটিল এবং বিচিত্র। এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য জীব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবার দস্তুরমত সাড়া পড়ে গেল। ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হল ডি. এন. এ সম্বন্ধে বহু তথ্য। একদিন প্রকাশ পেল, ডি. এন. এ-রা হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি। এইসব অণুর নাম নিউক্লিওটাইড। ওরা পরপর নিউক্লিয়াসের মধ্যে সজ্জিত থাকে। পরে ডি. এন.-এর পাঠোদ্ধারও করলেন বিজ্ঞানীরা। দেখলেন তাঁরা, অ্যাডেনিন, গুয়েনিন সাইটোসিন ও থাইমিন নামক চার রকমের জৈব ক্ষারক দিয়ে গঠিত ডি. এন. এ। এরাই জীবকোষ, এমনকি আস্ত প্রাণীদেহের সমূহ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। অথচ এরা নিজেরা কোন কাজ করে না। শরীরের কাজকর্মগুলি অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া সবই সংঘটিত হয় কতকগুলো এনজাইমের সহায়তায়। এই এনজাইমগুলিই প্রোটিন অণু। ডি. এন. এ অণুর মত না হলেও প্রোটিন অণুরাও বেশ বড়। এরা প্রাকৃতিক অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেই উৎপন্ন হয়। ডি. এন. এ-রাই ঠিক করে দেহের কোথায় কোন্ কোষে কোন্ এনজাইম কতটা তৈরি হবে।

সেই সময় তামাক গাছের পাতা আক্রমণকারী এক ধরনের ভাইরাসেরও সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। নামকরণ করা হল "টোবাকো মোজেইক ভাইরাস"। ঐ ভাইরাসদের বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখলেন, এদের মধ্যে আরও এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড

বর্তমান। ডি. এন. এ অপেক্ষা কিছুটা ছোট, আশিটির মত নিউক্লিওটাইড জুড়ে তৈরি অতিকায় এই নিউক্লিক অ্যাসিডের নাম রাখা হল রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর. এন. এ।

বিজ্ঞানীরা এতদিনে বুঝতে পারলেন ডি. এন. এ এবং আর এন. এ—এই দুই নিউক্লিক অ্যাসিডকে কেন্দ্র করেই জীবন। অবশ্য এই সব বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কারের পেছনে ছিল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উক্ত হাতিয়ারটিকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠলেন এবার। এদের মধ্যে যাঁরা মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে সমর্থ হলেন তাঁরা মিরস্কি, রিস, ক্যালান, গেল প্রভৃতি বিজ্ঞানী। জীবনের ক্ষেত্রে ডি. এন. এ ও আর এন. এ-র ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন মিরস্কি ও রিস। তাঁরা বাছুরের থাইমাস গ্রন্থির ক্রোমোজোমের উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন এখানে ডি এন. এ র পরিমাণ শতকরা ৪৭ এবং আর এন. এ-র পরিমাণ শতকরা ১৪ এ-র মত।

ক্যালান ও গেল ল্যাম্পব্রাশ জাতের প্রকাণ্ড এক ক্রোমোজোমের গঠন সম্বন্ধে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁরাও প্রমাণ করলেন, এখানেও ডি এন এ অণুর প্রাধান্য।

ডি এন এ অণু সংক্রান্ত গবেষণায় পেল্ক নামক এক বিজ্ঞানীর আবিষ্কারও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পারেন, ডি এন এজ নামে একজাতীয় এনজাইম ডি. এন এ অণুকে ধ্বংস করে দেয়। ঐ ডি. এন. এজ দ্বারা ডি এন. এ অণুকে ধ্বংস করে তিনি দেখলেন ক্রোমোজোমের আকারটাই নষ্ট হয়ে গেল।

উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন, জীবনের বৈচিত্র্যের মূলে আছে নিউক্লিক অ্যাসিড অণুর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জিন মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমের হ্রাসবৃদ্ধি এবং তার গঠনগত যে কোন পরিবর্তন হলেই জীবনের প্রকাশ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

নিউক্লিক অ্যাসিডের অসামান্য ভূমিকার কথা আবিষ্কৃত হল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এইখানে থেমে গেলেন না। তাঁদের মনে পুনরায় প্রশ্ন এল, কেমন করে অতি ক্ষুদ্র একটি অণু দেহের এমন সব জটিল বিষয়ের সমাধান করছে এবং কেমন করেই বা একটা জীবনকে বিকশিত ও পরিচালিত করছে?

এর উত্তরও একদিন লাভ করলেন বিজ্ঞানীরা। এই পর্যায়ে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যাঙ্গার এবং তার সহকর্মীদের গবেষণাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরাই প্রথম ইনসুলিন নামক হর্মোন প্রোটিনের সজ্জাক্রম আবিষ্কার করেন। অল্পকাল পরে এঁদের গবেষণাকে অবলম্বন করে পাউলিং নামে এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির দ্বিমাত্রিক সংগঠন। প্রায় একই সময়ে কেন্‌ড ও পেরুট্‌জ নামে দুজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন গ্লবিউলার প্রোটিন অণুর ত্রিমাত্রিক সংগঠন। এইসব আবিষ্কারগুলি প্রমাণ করল, প্রোটিনের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। ডি. এন. এ-ই তিন রকমের আর এম. এ-র সাহায্যে জীবকোষের রাইবোজোমের উপর হরেক রকমের এনজাইম বা প্রোটিন তৈরি করে।

এবার জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এল বিরাট রকমের এক আলোড়ন। নব নব আবিষ্কারের হল আয়োজন। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন জীবনের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে হলে প্রোটিন সংশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অতএব বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় পরীক্ষা-নলের মধ্যেই আরম্ভ হল প্রোটিন সংশ্লেষণের কাজ। দরকার হল, রাইবোজোম কণিকা, নিউক্লিক অ্যাসিড, এনজাইম এবং দ্রবণীয় রাইবোনিক অ্যাসিড।

এতদিনে বিজ্ঞানীরা জগৎকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিলেন। কর্ণবার্গ নামে আমেরিকাবাসী জনৈক বিজ্ঞানী হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন ডি এন. এ পলিমারেজ। আর তাঁরই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিওটাইটগুলো থেকে বিজ্ঞানীরা একদিন পরীক্ষা-

নলেই তৈরি করে ফেললেন ডি. এন. এ। তারপরে আর. এন. এ-ও তৈরি হয়ে গেল পরীক্ষা-নলের ভেতরে।

প্রকৃতপক্ষে এতদিনেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠল বিজ্ঞানীদের সামনে। তাঁরা বুঝতে পারলেন, নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু কেবলমাত্র প্রোটিন তৈরি করে না। প্রোটিন তৈরির হার, পরিমাণ, এমনকি সমূহ কাজকর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায় বলা যায় যে, জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে দু রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড ডি. এন. এ এবং আর. এন এ। অথচ এই দুই নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে তফাৎ অতি সামান্যই। অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও আর এন. এ. ডি. এন. এ-র মত অতিকায় ও জটিল অণু। কেবল ডি এন এ-র মধ্যে থাকে ডি অক্সিরাইবোজ ও থাইমিন এবং আর এন এ-র মধ্যে রাইবোজ ও ইউরাসিল। ডি. এন. এ যখন নিজের ছাঁচে ডি. এন এ তৈরি করে তখন বাহকের কাজ করে আর. এন এ। অন্যদিকে ডি. এন. এ. থেকে আর. এন. এ-ও তৈরি হয়।

কিন্তু গোলমাল আবার বাধল। কিছুকাল পরে বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেলেন এক জাতীয় ভাইরাসের। পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন, ঐ জাতের ভাইরাসদের মধ্যে ডি. এন এ অণু নেই। আছে কেবলমাত্র আর. এম এ অণু। এদের ক্ষেত্রে আর. এন এ অণুই অনুরূপ আর. এন. এ গঠন করতে পারে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীদের চিন্তার সীমা রইল না। কার গুরুত্ব বেশি, ডি এন. এ-র না আর. এন এ-র?

অন্য একটি চিন্তাও বিজ্ঞানীদের পেয়ে বসেছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, জীব সৃষ্টির আদিতে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর বুকে প্রথম ঐ ভাইরাসদেরই আগমন হয়েছিল। কারণ, ভাইরাসরা জড় ও জীবের মাঝামাঝি প্রকৃতির। ওরা প্রাণময় অণু মাত্র। জড় ও জীব, উভয় অবস্থায় থাকতে পারে। রাসায়নিক পদার্থের মত ওদের কেলাসিত করাও যায়। পুনরায় উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করলে জীবনের যাত্রা

শুরু করে এবং বংশ বৃদ্ধিও করে। বিজ্ঞানীদের এখন প্রশ্ন, যদি আদিম পৃথিবীর বুকে প্রথম ভাইরাসদের আগমন হয়ে থাকে, তাহলে কে এসেছিল আগে ডি. এন. এ কিংবা ঐ আর. এন. এ? বিজ্ঞানীরা এখনও এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। অপর পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে জড় পদার্থ থেকে বিজ্ঞানীরা ডি. এন. এ এবং আর এন. এ-কে প্রস্তুত করতে সমর্থ হলেও জীবন সৃষ্টি করতে পারেন নি। যদিও বিজ্ঞানীদের সেই চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এমন অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলবেন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা সৃষ্টি করবেন ঐ ভাইরাসকে। কৃত্রিমভাবে ঐখানেই শুরু হবে জীবনের অভিষেক।

কৃত্রিমভাবে জীবন সৃষ্টি করতে না পারলেও জীবনের বহু তথ্যই উদঘাটন করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলোর সঙ্গে আমাদের দেহের ও মনের যোগসূত্র অত্যন্ত নিবিড়। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানী পাউলিং দেখিয়েছেন, ওদের দেহে প্রোটিন তৈরির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না।

আরও বহু সত্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাতৃ জঠরের একটি মাত্র নিষিক্ত কোষ থেকে কোষ বিভাজনের ফলে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। এই কোষ বলতে প্রকৃতপক্ষে কোষ মধ্যস্থিত ডি. এন. এ। ডি. এন. এ-ই নির্ধারণ করে এককোষী থেকে বহুকোষী পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হওয়া এবং তার আকৃতি, গুণাগুণ প্রভৃতি। অতএব ঐ ডি এন. এ-তেই লেখা হয়ে আছে তার ভাগ্যলিপি, তার চরিত্র এবং তার বৈশিষ্ট্য। কালো, ফর্সা, মোটা, বেঁটে, চুল ও চোখের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সব কিছুই ডি. এন. এ অণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের ফল। তবে বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, চারিত্রিক মাধুর্য প্রভৃতির পশ্চাতে ডি. এন. এ-র যে কতখানি যোগ তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি।

আশাবাদী বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জীবনের রহস্য উদঘাটন করেছেন।

পাঠ করেছেন ডি. এন. এ-র গঠন। জীনও তৈরি করেছেন টেষ্টটিউবের মধ্যে। ভবিষ্যতে তাঁরা এমন জীনও তৈরী করতে সমর্থ হবেন যাকে শিশুদেহে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শিশুর জীবনকে অন্যভাবে পরিচালিত করতে পারবেন। হয়ত এইভাবে বংশগত রোগকেও দূরীভূত করতে পারবেন।

অদূর ভবিষ্যতে হয়ত অবিশ্বাস্য অনেক তথ্যই আবিষ্কৃত হবে। যদি কোন বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে জড় পদার্থগুলির সমন্বয় সাধন করে একটি মানব শিশুকে উপহার দেন তাতেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আর দেখা যাচ্ছে না।

যেসব বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে অবলম্বন করে আজকের বিজ্ঞানীরা এমন অসাধ্যকে সাধন করতে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতীয় বংশধর ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা। অপর দুই মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট ডব্লু হোলি এবং মার্শাল ডব্লু. নিরেন বার্গের সঙ্গে তিনি জেনেটিক কোড-এর ব্যাখ্যা প্রদান করে জীবকোষের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেছেন। উক্ত কারণে এঁদের তিনজনকেই সম্মানিত করা হয়েছে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন ম্যাক্স ডেলব্রুক, আলফ্রেড হারসে এবং সালভাদোর লুরিয়া নামে তিনজন বিজ্ঞানী। এঁরাই প্রমাণ করেছেন, বংশগতির মুখ্য নায়ক ডি. এন. এ অথবা আর. এন এ। নোবেল পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন এঁরা।

সত্যকথা বলতে কি, জীবনের রহস্য আজ একরকম জানা হয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের। তাইতো তাঁদের চেষ্টা কৃত্রিমভাবে জীবকোষ উৎপন্ন করতে। সেই শুভদিনটির জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে পৃথিবীর মানুষ।

শরীরের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা

আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আমাদের চারপাশে কারা সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে তোমরা নিশ্চয়ই ভূত প্রেতের নাম করবে না। বলবে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু এবং ভাইরাসের দল।

ভয়ানক সাংঘাতিক ওরা। সর্বত্র ওদের গতিবিধি। একটু সুযোগ পেলেই সুস্থ শরীরে ভর করে। তারপর ঘাড় মটকাতে চেষ্টা করে। যতদিন পর্যন্ত এদের অস্তিত্ব মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল, ততদিন মানুষ এদের কারও কারও আক্রমণকে ভূত কিংবা অপদেবতার আক্রমণ বলেই ধরে এসেছিল। সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার এখন যে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এমনও নয়। তবে তোমরা যে ভূতে বিশ্বাস কর না, তা জানা আছে। শুধু ভূতের গল্প পড়তেই তোমাদের ভাল লাগে। তাই ভূতের কথা দিয়ে গল্পটা আরম্ভ করা গেল।

জীবাণু-ভূতের কথাটা অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও যে সাংঘাতিক ভূত ঐ ভাইরাস, সে সম্বন্ধে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন অতি সাম্প্রতিককালে। অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার কিছুকাল পরে। ঐ বিস্ময়কর তথা ভূত ধরার যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন নাল ও রাস্ক নামে দুজন বিজ্ঞানী। যন্ত্রের দৌলতে চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত করে যখন কোন বস্তুকণার উপর প্রতিফলিত করা হয় তখন ঐ বস্তু-কণাটির প্রায় দু'লক্ষগুণের মত বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। ঐ প্রতিবিম্বের আলোকচিত্র গ্রহণ করে পুনরায় যখন সাধারণ লেন্সের সামনে আনা হয় তখন আরও পাঁচ সাত গুণ বড় দেখায়, তাই সম্ভব হয়েছে ভাইরাসদের চিত্র গ্রহণ করা। দেখা গেছে, ভাইরাসরা এত ক্ষুদ্র

যে তাদের কোনটির ব্যাস মাত্র এক মিলিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

ভাইরাসদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা সব রকমের জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ এমনকি ক্ষুদ্র জীবাণুর দেহেও আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। সরল এদের দৈহিক গঠন। বাহিরে একটি মাত্র প্রোটিনের আবরণ থাকে। কোন কোষপ্রাচীর নেই। উক্ত কারণে অনেকে ভাইরাসদের কোষ-বিহীন বলতে চান।

ভাইরাসদের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে আছে নিউক্লিক অ্যাসিড। পোলিও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের ভাইরাসদের মধ্যে পাওয়া যায় কেবল রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর. এন. এ এবং বসন্ত প্রভৃতির ভাইরাসে থাকে শুধু ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি. এন. এ। বাঘ, ভালুক কিংবা বিষধর সর্পের চেয়েও ভয়ঙ্কর ভাইরাসরা। বসন্ত, হাম, সর্দি, ডেঙ্গু, পোলিও, পীতজ্বর, জলাতঙ্ক, মস্তিষ্কের প্রদাহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা চোখ ওঠা প্রভৃতি হরেক রকমের ব্যাধি ঐ ভাইরাসদের দ্বারা সুস্থ দেহে সংক্রমিত হয়।

বাতাসে সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ভাইরাস। যখন ওদের দ্বারা কোন সুস্থ জীবকোষ আক্রান্ত হয় তখন ওরা প্রথমে সুস্থ কোষটির প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন হয়। তারপর সে তার দেহস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড এবং কিছু কিছু দেহসার সুস্থ কোষটির অভ্যন্তরে অবস্থিত পদার্থগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তখন সুস্থ কোষটির নিজস্ব কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষ বাধ্য হয়ে ভাইরাসের উপযোগী নিউক্লিক অ্যাসিড ও দেহসার উৎপাদন করতে থাকে। তারপর নিউক্লিক অ্যাসিড ও দেহসার মিলে জন্মদান করে নতুন ভাইরাসের। অবশেষে আক্রান্ত কোষের মধ্যে বংশ বিস্তারের দ্বারা ভাইরাসদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে কোষটি ফেটে যায় এবং সমূহ ভাইরাস বেরিয়ে এসে অন্যান্য কোষকে আক্রমণ করে।

ভাইরাসরা সম্পুর্ণরূপে পরজীবী। এরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে

কিছুতেই স্বাধীনভাবে বংশবিস্তার করতে পারে না। তাই সব সময় ওরা ভূতের মত সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ায় এবং চেষ্টা করে কোন জীবকোষ অথবা উদ্ভিদ কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে। আরও আশ্চর্যের কথা, বাতাসে ওরা থাকে অসংখ্য। তত্নপরি জীব ও জড় উভয় অবস্থায়ও ওরা অবস্থান করতে পারে। তাই সুস্থ শরীরের সংস্পর্শে প্রতিদিন কত যে ভাইরাস আসে তার কোন পরিসীমা নেই। ভয়ঙ্কর এইসব ভাইরাস থেকে কোন জীব কিংবা কোন উদ্ভিদের নিস্তারও নেই। অর্থাৎ যে কোন জীব বা উদ্ভিদ দেহে ওরা বাসা বাঁধতে পারে।

এবার একটি প্রশ্ন সুস্থ দেহের সংস্পর্শে প্রতিদিন যদি এত ভাইরাস এসে থাকে এবং যদি তার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই, তাহলে সবাইকে তো সবসময় অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হত এবং একদিন যে কোন সময়ে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে হত। কিন্তু কেন এমনটি হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না সবসময় অসুখ?

দ্বিতীয়ত জলের মধ্যে এবং ধূলিকণার সঙ্গেও জীবাণুর পরিমাণ বড় কম থাকে না। খেয়ালি লিউয়েনহোয়েক প্রথম যেদিন আপন তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র একটি ফোঁটা নর্দমার জলকে পরীক্ষা করেছিলেন, সেদিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিলেন। সেই এক ফোঁটাতেই অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছিল। লুই পাস্তুরও একদিন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার জীবাণু। অতএব সাধু সাবধান!

এখন প্রশ্ন, এত যে জীবাণু এবং ভাইরাস আমাদের অলক্ষ্যে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিচরণ করছে, যাদের সংস্পর্শে আমরা প্রতি মুহূর্তেই আসছি, তারা আমাদের দেহে কী প্রবেশ করছে না? অপর দিকে আহারের সময় এবং জলপানের সময়ও প্রতিদিন গলাধঃকরণ করছি হাজার হাজার জীবাণুকে। তথাপি কেন আমরা

সর্বদা রোগ ভোগ করছি না, কিংবা ভালভাবে সতকর্তা অবলম্বন করতে হচ্ছে না ?

এর উত্তরে তোমরা হয়ত বলেই বসবে, শরীরের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বলে একটি ক্ষমতা সবার মধ্যে আছে। যার এই ক্ষমতা থাকে তার অসুখ হয় না, আর যার নেই তারই কেবল অসুখ হয়ে থাকে। কিন্তু কী সেই প্রতিষেধক ক্ষমতা ?

আরও একটা বিষয় তোমরা ভেবে দেখতে পার। ধর, তোমরা চল্লিশটি ছেলে একই শ্রেণীতে পড়ছো। তোমাদের এক বন্ধুর হল চোখ ওঠা রোগ। তার চোখ থেকে অসংখ্য ভাইরাস বেরিয়ে এসে আক্রমণ করলে সবাইকে কিন্তু দেখা গেল, মাত্র কয়েকজন খুব করে চোখ ওঠা রোগে কষ্ট ভোগ করল। কয়েকজনের চোখ লাল হল, জলও ঝরল, কিন্তু দুদিনেই চোখ সেরে গেল। বাকি কয়েকজনের আদৌ চোখ উঠল না।

ধরলাম, যার প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে তার হল না। কিন্তু একজনের বেশি, আর একজনের কম কেন ? প্রতিষেধক ক্ষমতাটাও কী বেশি কম থাকে ?

তোমরা হয়তো বলবে, ঠিক তাই। কেউ মোটা, কেউ পাতলা। কেউ রোগা, কেউ স্বাস্থ্যবান। কেউ পঞ্চাশ কিলোগ্রাম বোঝা বহন করতে পারে, কেউ পাঁচ কিলোগ্রাম বহন করলে হাঁপিয়ে উঠে। অতএব রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বেশি কম থাকার অসুবিধা কোথায় ?

তাহলে, কী সেই ক্ষমতা ? কোথা থেকে শরীর তাকে লাভ করে ? উক্ত ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত না অর্জিত ?

এবার তোমরা হয়ত একটু বেকাদায় পড়বে। যেমন একদিন বিজ্ঞানীরা ঐ ক্ষমতার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরাও রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা নামক ক্ষমতাটির উপর ছিলেন যথেষ্ট আস্থাবান। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জানতে চেষ্টা করলেন উক্ত ক্ষমতাটির বিজ্ঞানসম্মত কারণ।

চিন্তা করলেন, শরীরের কোথায় এবং কী ভাবে লুকিয়ে থাকে এই ক্ষমতা? অথবা কে বা কারা প্রতিহত করে জীবাণু ও ভাইরাসদের আক্রমণকে?

বিজ্ঞানীরা উক্ত প্রশ্নগুলির কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যথাযথভাবে উত্তর দিতে পারেন নি। অনেকদিন ধরে তাঁদের গবেষণা করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সঠিক উত্তর পাওয়া গেল ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বারুজ বেনাসেরাফ এবং হুঘ ম্যাকডেভিট নামক তু'জন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে। প্রকৃত-পক্ষে বহু বিজ্ঞানীর বহুকালের প্রচেষ্টা সেদিন সার্থক হয়েছিল ওঁদের তুজনেরই হাতে।

অপরাপর অনেক বিজ্ঞানীর মত বেনাসেরাফ এবং ম্যাকডেভিট শরীরের রোগ প্রতিষেধকের দিকেই আকর্ষণ বোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ইঁতুর এবং গিনিপিগদের উপর নানাবিধ পরীক্ষা চালাতেন। একবার একটি গিনিপিগের দেহকোষে বিশেষ ধরনের এক রোগ জীবাণুকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেখলেন, রোগজীবাণু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জীন হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল। বিস্মিত বড় কম হলেন না তাঁরা। অবশেষে সেই জীনগুলিকে নিয়েই আরম্ভ করলেন পরীক্ষা। এক সময় বুঝতে পারলেন, রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে এই জাতীয় জীনরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

এবার নতুন উত্তমে মেতে উঠলেন বিজ্ঞানীদ্বয়। কোন বিষাক্ত পদার্থকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করালে ফলটা কী হয় জানার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর। একটি হৃষ্টপুষ্ট ইঁতুর এবং একটি গিনিপিগকে গ্রহণ করলেন এবং প্রয়োগ করলেন অতি অল্প পরিমাণে বিষ। এবারে কিন্তু ভয়ানক অবাক হতে হল তাঁদের। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বিষ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের রক্তে হঠাৎ তৈরি হয়ে গেল প্রতিরোধকারী এক ধরনের শ্বেত কণিকা এবং এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন অণু। বিজ্ঞানের পরিভাষায় ঐ শ্বেত কণিকার নাম লিমফোসাইটিস এবং প্রতিরোধকারী প্রোটিন অণুর নাম অ্যান্টিবডি।

অতঃপর রোগ জীবাণুদের ইঁদুর ও গিনিপিগের দেহে প্রয়োগ করে চালালেন অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা। এক্ষেত্রেও দেখলেন, রোগ প্রতিরোধকারী লিমফোসাইটিস ও অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আর সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করতে ছুটে আসছে রোগ জীবাণুদের। একরকম বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাওয়ার মত ব্যাপারটা। কিংবা রসায়ন বিজ্ঞানের সেই প্রশমনের ঘটনা যেন। ক্ষার ও অম্ল যখন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তখন অম্লের অম্লত্ব অথবা ক্ষারের ক্ষারত্ব কিছুই থাকে না, উভয়ে উভয়কে প্রশমিত করে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ তথা লবণ ও জল গঠন করে—এ যেন অনেকটা তাই। রোগ জীবাণু ও অ্যান্টিবডি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া বিক্রিয়া করে এবং দুই-ই বিক্রিয়ার ফলে প্রশমিত হয়ে যায়।

উপরোক্ত সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেনাসেরাফ এবং ম্যাকডেভিট বহু ইঁদুর ও গিনিপিগের উপর বহুকাল ধরে চালিয়ে ছিলেন তাঁদের পরীক্ষা। সর্বশেষে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সুস্থ শরীরে রোগজীবাণু প্রতিরোধ করার জন্য যে অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হয়—তা সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। অর্থাৎ অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করার ক্ষমতা সব দেহের সমান নেই। কারও কম, কারও বা বেশী। আবার কারও শরীর অদৌ অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে সমর্থ হয় না। তার কারণও ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। বলেছেন, অ্যান্টিবডি তৈরির ব্যাপারটা কোষ মধ্যস্থিত এক বিশেষ ধরনের জীনের উপর নির্ভরশীল। ঐ জীনদেরও তাঁরা নামকরণ করেছেন। নামটা ইম্যুনো রেসপন্স জীন।

বিজ্ঞানী বেনাসেরাফ আরও প্রমাণ করেছেন, ইম্যুনো রেসপন্স জাতীয় জীন জীবমাত্রই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। যেহেতু জীন পিতা-মাতার কাছ থেকেই সন্তান লাভ করে, তাই উক্ত ব্যাপারটাকে বংশগত গুণ বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বিস্ময়কর এই আবিষ্কারটির জন্য বেনাসেরাফ এবং ম্যাকডেভিট্‌কে

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তবে অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের ব্যাপারটা তাঁরা অনেক আগেই আবিষ্কার করেছিলেন।

রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে অ্যান্টিবডির ভূমিকা সম্বন্ধে আরও অনেকে গবেষণা করেছিলেন। বেনাসেরাফরা কিন্তু অ্যান্টিবডির কথা ঘোষণা করলেও ওর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন নি। অ্যান্টিবডির রাসায়নিক গঠন পাঠ করে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ জেরাল্ড মরিস এডেলম্যান এবং বৃটিশ জীবাণুতত্ত্ববিদ ডঃ রোডনি পোর্টার। এই কারণে এঁদের দুজনকেই ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল।

এডেলম্যান ও পোর্টারের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, অ্যান্টিবডিরা হচ্ছে অতিকায় এক জটিল রাসায়নিক অণু। প্যাপাইন নামে এক জাতীয় এনজাইমের সাহায্যে রোডনি পোর্টার অ্যান্টিবডিকে ভেঙ্গেও ছিলেন। দেখেছিলেন, অ্যান্টিবডিটি ত্রিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী Y (ওয়াই) অক্ষরের রূপ গ্রহণ করল। Y অক্ষরের তিনটি অংশ। মাথায় দুটি ছোট ছোট দাঁড়ি এবং নিচের দাঁড়িটা অপেক্ষাকৃত বেশ বড়। পোর্টারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছোট অংশ দুটিই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করা রোগজীবাণুদের ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু বড় অংশটি কোন কাজ করে না।

এডেলম্যান ও পোর্টার উভয়ে একত্র হয়ে গবেষণা করতেন না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও এককভাবে গবেষণা করে উভয়ে প্রায় একই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছিলেন এডেলম্যান। তিনিই জানিয়েছিলেন, অ্যান্টিবডিরাও এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড। এরা উৎপন্ন হওয়ার পর শৃঙ্খলিত অবস্থায় অবস্থান করে। অন্যদিকে সব রোগকে প্রতিহত করতে একই প্রকারের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্টিবডি দেহে উৎপন্ন হয়। *অ্যান্টিবডিরা কিভাবে রোগজীবাণুদের সঙ্গে সংগ্রামে* লিপ্ত হয় সে খবরও এডেলম্যান জানিয়েছেন।

বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত গবেষণা থেকেই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা যে কী জিনিস তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমরা ধরে নিতে পার, তোমাদের দেহকোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে যদি ইম্যুনো রেসপন্স জীন থাকে তাহলে তোমাদের দেহে জীবাণু বা ভাইরাস অনুপ্রবিষ্ট হলেও কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে ফেলবে লিমফোসাইট এবং অ্যান্টিবডি নামক প্রোটিন অণু। তবে উক্ত জীন কোন ব্যক্তিবিশেষের দেহে আদৌ অবস্থান করে না এমন নয়। বেশি, কম—এই আর কি? অর্থাৎ শরীর আমাদের রাজা। আর ঐ জীন আমাদের দেহরক্ষক। ঘরে বাহিরে বিস্তর শত্রুর হাত থেকে রাজাকে রক্ষা করে তার দেহরক্ষীরা। তেমনি বাহিরের অদৃশ্যচারী শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করছে ঐ জীনরা। রাজার দেহরক্ষী এবং সৈন্য-সামন্তের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে শক্তিশালী শত্রুর কাছে তাঁকে যেমন কাবু হতে হয়, ঠিক সেইভাবে কোনো দেহে ইম্যুনো রেসপন্স জীনের অভাব থাকলে বহিঃশত্রু ঐ সব রোগজীবাণু এবং ভাইরাসদের আক্রমণে আমাদেরও শয্যাশায়ী হতে হয়।

ইম্যুনো রেসপন্স জীন আবিষ্কার হওয়ার পর অনেক বিজ্ঞানী সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং ঐ জীন সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন! তাঁদের ধারণা, কোন প্রকারে শরীরের মধ্যে উক্ত জীনকে অনুপ্রবেশ করাতে পারলে শরীরের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়বে। ফলে বহু রোগকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। এমন কি ক্যান্সার নামক দুরারোগ্য ব্যাধিটিকেও।

অনেক সময় একের দেহে অন্যের হৃৎপিণ্ড, কিডনী প্রভৃতি প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে চিকিৎসকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনও হয়, একের হৃৎপিণ্ড বা কিডনী অপরের শরীরে ভালভাবে কাজ করছে না। কখনও কখনও নতুনভাবে সংযোজিত যন্ত্রটিকে শরীর আদৌ গ্রহণই করতে চায় না। অনুকূল পরিবেশ দান

করলেও নয়। সেক্ষেত্রে শরীর যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানই করছে।

উক্ত ঘটনার মূলেও আছে ঐ ইম্যুনো রেসপন্স জীন। এই জীনের প্রকৃতি ও পরিমাণ সবার দেহে সমান নয়। যেখানে সমান পাওয়া যায় সেখানে কিছু মাত্র অসুবিধা উপলব্ধি করেন না চিকিৎসকরা। রক্তের ব্যাপারও অনেকটা তাই। তোমরা জান, কোন রোগীকে রক্তদান করতে হলে আগে তার নিজের দেহের রক্তকে পরীক্ষা করতে হয়। তারপর সেই রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করে কোন শ্রেণীর রক্ত লাগবে তা নির্ধারণ করেন চিকিৎসকরা। আরও দেখা গেছে, একই পিতামাতার সন্তান একে অপরকে রক্তদান করলে আদৌ, অসুবিধা হয় না বরং শরীর ভালভাবেই গ্রহণ করে। আবার পিতামাতাকে ছেলেমেয়েরা রক্ত দান করলেও কোন ক্ষতি হয় না।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীনই এইসব ব্যাপারের মূলে কাজ করে। তবে ইম্যুনো রেসপন্স জীনের সঠিক পরিচয় এখনও বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে ধরা পড়বে সব কিছু। হয়ত সেদিন ঐ জীনের দ্বারা মানুষ অসাধ্যকে সাধন করবে। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করবে রোগ ব্যাধিদের। বিশ্বের অমৃতের পুত্রগণ অমৃত আহরণ করে স্বর্গভূমি রচনা করবে। যদি এই সুযোগ আসতে দেরি হয়, তাহলে তোমরাও বড় হয়ে এ বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করো। কে বলতে পারে, তোমাদের হাতে এর শুভ সূচনা হবে না?

টমোগ্রাফী

তোমাদের কথা দিয়েই গপ্‌পোটা শুরু করা যেতে পারে।

তোমরা সবাই খেলাধূলা করতে ভালবাস, ভালবাস দৌড়ঝাঁপ করতে। স্কুলে যাওয়ার পথে অথবা স্কুল থেকে ফেরার পথেও একটু ছুটাছুটি না করলে মনটা যেন ভাল থাকেনা তোমাদের। তারপর সন্ধ্যার দিকে তো কথাই নেই। ব্যাট হাতে নয়ত বল গড়াতে গড়াতে হাজির হও ফাঁকা জায়গায়। কেউ বা ঘুড়ি লাটাই পেলে খাওয়ার কথাও ভুলে যাও।

এর জন্য মাঝে মাঝে তুর্ভোগটাও বড় কম ভোগ করতে হয় না তোমাদের। বেশ আছাড় খেতে হয় মাঝে মাঝে। কখনও পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি। কখনও হাতে পায়ে লাগে ভয়ানক চোট। দারুণ যন্ত্রণা! বন্ধুরা পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসে। বাবা মা, ভাই, বোন সবাই অস্থির হয়ে উঠেন। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাসপাতালে নয়ত ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু চোট লাগা জায়গাটা ভাল করে টিপে টিপে দেখেন। তখন "উঃ" "আ" করতে থাক। তারপর একসময় ডাক্তারবাবু মুখটা হাঁড়ির মত করে শুইয়ে দেন এক্স-রে প্লেটের উপর। ছবি গ্রহণ করেন। পরিশেষে ঘোষণা করেন, হাড় ভেঙ্গে তুখানা হয়ে গেছে। অতএব প্লাস্টার অনিবার্য।

সঙ্গে সঙ্গে হোক, অথবা তু-এক দিন পরে হোক, প্লাস্টার করা হাতখানাকে সাদা ন্যাকড়ার ফালিতে বেঁধে, গলায় ঝুলিয়ে নিতান্ত সুবোধ বালকের মত ফিরে আস ঘরে।

কিন্তু দেখেছো সেই এক্স-রে-র ছবিটা ?

হাড় বা হাড়ের ভাঙ্গা জায়গা বেশ বুঝা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে হাড়ের ব্যাসটা। তবে হাড়টা গোল কি চ্যাপ্টা, উপরটা মসৃণ কিংবা

উঁচুনিচু, এককথায় পুরো অবয়বটা দেখা যায় না। তাই যে পাশে ছবি নেওয়া হল তার বিপরীত পাশে কোন জায়গায় কোন ক্ষতি যদি হয়ে থাকে তাও ধরতে পারেন না ডাক্তার। তেমন অসুবিধায় পড়লে ডাক্তারকে অন্যপাশের ছবি গ্রহণ করতে হয় কিংবা বিভিন্ন অবস্থানের অনেকগুলো ছবি গ্রহণ করে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হয়। তারপরেই মন্তব্য করেন, কোন্ কোন্ জায়গায় কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে।

অনেক সময় হাড় ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যায় না। কেবলমাত্র এক জায়গায় ফেটে যায়। এক্ষেত্রে এক্স-রে করলে ফাটলটা ধরা পড়ে সত্য, কিন্তু ফাটলটা কত গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত তা ধরা পড়ে না।

কেবল হাড় নয়, শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও কোন অংশে যদি টিউমার হয়ে থাকে তাহলে তাকেও সনাক্ত করতে এক্স-রে-র সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। হাড়ই হোক আর টিউমারই হোক, সর্বক্ষেত্রেই এক্স-রে-র যে ছবি পাওয়া যায় তা দ্বিমাত্রিক। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পাওয়া যায় কিন্তু বেধ পাওয়া যায় না। এক্স-রে-র সাহায্যে শরীরের কোন অংশে টিউমার হয়েছে সেটা না হয় বুঝা গেল। টিউমারটির চরিত্র কেমন তাও নির্ণয় করা গেল তেজস্ক্রিয় বস্তু তথা রেডিও অ্যাকটিভ ট্রেসারের সাহায্যে। কিন্তু যে ছবিটি পাওয়া গেল, সেটি কেবলমাত্র একটি সামতলিক ক্ষেত্রের উপর টিউমারের প্রস্থচ্ছেদের ছবি। টিউমারটির গভীরতা কিংবা টিউমারের মধ্যে ক্যান্সার দানা বেঁধেছে কিনা ঠিকঠিক ধরতে পারা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ একখানা ফটোর কথা ধরতে পার। তোমাদের অনেকেরই একাধিক ফটো আছে। হয়ত এমন একটি জায়গায় ফটো তুলেছো, যেখানে একটি বড় গাছ ছিল। মনে কর, ঠিক তোমার পেছনেই গাছটা। এখন যে ছবিটি পেয়েছো, তাতে গাছের ছবিও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গাছটা তোমার কাছ থেকে কতদূরে, কিংবা তার শাখাপ্রশাখা তোমার মাথার উপর কতটা উচ্চে, ফটো থেকে কিছুই বলতে পারবে না। অপর দিকে মুখের আদলটা ঠিক

থাকলেও চোখ, কান, নাক প্রভৃতি সম্বন্ধেও পাওয়া যাবে না নিখুঁত তথ্য। তবে হ্যাঁ, একটির বদলে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে তোমার যদি অনেকগুলি ফটো গ্রহণ করা হতো তাহলে ফটোগুলোকে মিলিয়ে দেখতে পারলে অনেক তথ্যই উদ্ধার করতে পারতে।

ঠিক এইভাবে শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও কোন টিউমার হলে ডাক্তাররা বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে এক্স-রে-র সাহায্যে অনেকগুলি ছবি নিয়ে থাকেন। তারপর টিউমারটির একটি ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। ফলে টিউমারের আকার, কোন বিশেষ স্থান থেকে কতটা দূরে ইত্যাদি বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেন। টমোগ্রাফীর ব্যাপার অনেকটা ঐ রকমই। এখানেও এক্স-রে-র সাহায্যে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে টিউমার বা ক্ষতস্থানের অনেকগুলি ছবি গ্রহণ করা হয় এবং ছবিগুলিকে যুক্ত করে ত্রিমাত্রিক অবস্থান ঠিক করা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসকদের আন্দাজের উপর নির্ভর করতে হয় না। যন্ত্রগণকের সাহায্যে খাঁটি গাণিতিক উপায়ে ছবিগুলিকে জুড়ে দিয়ে গঠন করা হয় ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। ফলে চিকিৎসকদের আদৌ অসুবিধায় পড়তে হয় না কিংবা সামান্যতম ভুলেরও অবকাশ থাকে না। টিউমারগ্রস্ত স্থানটি অতি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে ছবিতে। মানুষ ভুল করলেও যন্ত্র ভুল করতে পারে না। তাই সুবিধা হয় চিকিৎসকদের। তাঁরা বুঝতে পারেন, ক্ষতস্থানটি কেমন ধরনের? অস্ত্রোপচার করতে হবে কিনা অথবা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করতে হবে কিনা, তাও অতি সহজে নির্ণয় করা যায়। উক্ত কারণে টমোগ্রাফী শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিশেষ করে মস্তিষ্কে ও হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে আজকাল টমোগ্রাফীর সাহায্য গ্রহণ না করলে একেবারেই চলে না।

টমোগ্রাফী আসলে একটি পদ্ধতি মাত্র। পদ্ধতিটির একমাত্র সহায় এক্স-রে। টমোগ্রাফীর পুর্ণ নাম কমপিউটারাইজড অ্যাকসিয়াল

টমোগ্রাফী। ঐ শব্দ তিনটির আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত CAT (ক্যাট) দ্বারা সংক্ষেপে পদ্ধতিটিকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

টমোগ্রাফী বা সংক্ষেপে CAT এক ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যাকে বুঝায়। তবে চিকিৎসাক্ষেত্রে উক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব যে অসাধারণ সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সহজ হয়েছে মারাত্মক রোগগুলিকে সনাক্ত করা। ফলে নানা দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করছে বহু মানুষ। তাই এক কথায় বলা যেতে পারে মানব সভ্যতার ইতিহাসে টমোগ্রাফী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

অন্যান্য অনেক আবিষ্কারের মত টমোগ্রাফী আবিষ্কারের পেছনেও একটি ইতিহাস আছে। সর্বপ্রথম এই বিষয়ে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন অষ্ট্রিয়ার একজন নামকরা গণিতজ্ঞ ডঃ জে. রাদোন। তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা এক্স-রে-র ছবিগুলিকে গাণিতিক পদ্ধতিতে সংযুক্ত করে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করা সম্ভব। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে একেবারে নীরব ছিলেন।

তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হলেও এই অভিনব পদ্ধতিটির দিকে আকর্ষণ বোধ করেন অনেক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। তাঁরা এ বিষয়ে আরম্ভ করলেন গবেষণা। অনেকে আবার নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও মেতে উঠলেন। শেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বিজ্ঞানীর চেষ্টায় সম্ভব হল ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করা। তবে তাঁরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটি তেমন উন্নত ছিল না এবং সহজও ছিল না আদৌ। ফলে উক্ত পদ্ধতি বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করল না। ভাল পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য প্রচেষ্টা রইল অব্যাহত। অনেকদিন পরে জয়যুক্ত হলেন ইংলণ্ডের জনৈক প্রযুক্তিবিদ, নাম গডফ্রে নিউবোল্ড হাউনসফিল্ড। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন ই. এম. আই। যন্ত্রটিতে

প্রধান অংশরূপে ছিল এক্স-রে উৎস এবং ফটোগ্রাফিক ফিল্ম। রোগীকে রাখা হত এক্স-রে উৎস এবং ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। রোগীকে স্থিরভাবে বসিয়ে অথবা দাঁড় করিয়ে প্রথমে একটি এক্স-রে ছবি গ্রহণ করার পর এক্স-রে-র উৎসটিকে ধীরে ধীরে পাশের দিকে সরানো হত এবং ফিল্মটিকে সরাতে হত বিপরীত দিকে। আর প্রতিটি অবস্থানের উপর গ্রহণ করা হত ছবি। বলা বাহুল্য রোগীর এতটুকু নড়াচড়া হওয়ার উপায় ছিল না।

এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশের বেশ কিছু সংখ্যক ছবি গ্রহণ করার পর ছবিগুলিকে যন্ত্রগণকের কাছে ধরা হত। তারপর ঐ যন্ত্রগণকই গঠন করে দিত ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব।

হাউন্সফিল্ডের উপরোক্ত পদ্ধতিকে এখনও অনুসরণ করা হয়। তবে অনেকের হাতে পড়ে পদ্ধতিটির আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। যাঁর বিশেষ অবদানকে কেন্দ্র করে যন্ত্রটির অভাবনীয়ভাবে উন্নতি হয়েছে তাঁর নাম অ্যালেন ম্যাকলিওড করম্যাক। জন্ম দক্ষিণ আমেরিকায়। পদার্থ বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কেপটাউন হাসপাতালের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। হাসপাতালে তাঁর কাজ ছিল, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে ক্যান্সার রোগ সনাক্ত করা। উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কালে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো তাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিপদও ঘটত।

করম্যাক অসুবিধা অনুভব করেই ক্যান্সার সঠিকভাবে নির্ণয় করার বিকল্প পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে থাকেন। সেই সময় তাঁর মনে লাগে টমোগ্রাফীক পদ্ধতির তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটা। অতঃপর করম্যাকের আরম্ভ হয় গবেষণা। অবশেষে এক ধরনের বিশেষ যন্ত্রগণকের সাহায্য গ্রহণ করে টমোগ্রাফীর আর একটি তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করেন।

জে. রাদোন এবং করম্যাকের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলিকেই বাস্তবে

রূপায়িত করেছিলেন হাউন্‌সফিল্ড। বহুদিন ধরে তাঁকে এ বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। তারপর ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যন্ত্রটি প্রস্তুত করতে সমর্থ হন এবং প্রথম চালু হয় ইংলণ্ডেই।

যন্ত্রটি আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। ঐ বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাউন্‌সফিল্ডের একটি যন্ত্র ক্রয় করেন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। তারপর সেটিকে স্থাপন করেন বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিকে। কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও ডাক আসে। এখন পৃথিবীর বহু হাসপাতালেই আছে যন্ত্রটি।

চিকিৎসাক্ষেত্রে যন্ত্রটির অসামান্য অবদানের জন্য প্রযুক্তিবিদ হওয়া সত্ত্বেও হাউন্‌সফিল্ডকে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে উক্ত পুরস্কার দান করে সম্মানিত করা হয়েছে করম্যাককেও। করম্যাক পদার্থবিজ্ঞানী আর হাউন্‌সফিল্ড একজন প্রযুক্তিবিদ। উভয়ের কেউ শরীর বা চিকিৎসা বিজ্ঞানী নন। তথাপি মানবকল্যাণে টমোগ্রাফীর ভূমিকার কথা স্মরণ করে ঐ চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের পুরস্কারটিই প্রদান করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রদানের ইতিহাসে এমন নজির খুব কমই আছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমানে ছবিতে ও কোন ব্যক্তি কিংবা কোন বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম হলোগ্রাফী এবং যে ফিল্মের উপর কোন কিছুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করার রীতি অঙ্কিত হয় তাকে বলা হয় হলোগ্রাম।

সাধারণ ফটোগ্রাফীতে বস্তুর দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। সেই প্রতিবিম্ব থেকে বস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার খুঁটিনাটি বিবরণ লাভ করা যায় না বলে অনেকে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। প্রথমে যিনি এ বিষয়ে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, তিনি অধ্যাপক ডানিস গাবর। ইনি ছিলেন এক পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞ। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নিয়েই

কাজ করতেন। এক সময় তাঁর মনে ত্রিমাত্রিক ছবির পরিকল্পনা আসে। ভাবতে আরম্ভ করেন, কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দেখা মাত্রই ছবির প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে? অর্থাৎ বস্তুটির প্রকৃত আকার, আয়তন পাশাপাশি বস্তুগুলি থেকে দূরত্ব, এক কথায় কোন বাস্তব দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করে যেমন ভাবে আমরা একটা নিখুঁত ধারণাকে মনে পোষণ করে থাকি, ঠিক তেমনটি।

ভাবতে ভাবতে প্রথমে আলোকের দুটি নিয়মের কথা তাঁর মনে আসে। একটি ইনটারফিয়ারেন্স অফ লাইট বা আলোকের ব্যতিচার এবং অপরটি ডিফ্রাকশন অফ লাইট বা আলোর বিচ্ছুরণ। প্রথম নিয়ম অনুযায়ী সম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি আলোকরশ্মি দুটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে যদি তরঙ্গাকারে অগ্রসর হওয়ার পর একটি পর্দার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে সমদশায় আপতিত হয় তাহলে আলোকের দীপ্তি হবে সর্বোচ্চ আর যদি বিপরীত দশায় আপতিত হয় তাহলে দীপ্তি হবে সর্বনিম্ন। উক্ত কারণে পর্দার উপর পর্যায়ক্রমে আলোকিত ও অন্ধকার রেখার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিচ্ছুরণের নিয়ম অনুযায়ী আলোকরশ্মি যখন কোন ধারালো পাতের ধার বরাবর বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ঐ ধারে রশ্মির গতিপথ বেঁকে যায়।

গাবরের যেন মনে হল, এই দুটি তত্ত্বকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করা সম্ভব হবে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি হলেন ব্যর্থ।

কারণও ছিল। তখনকার দিনে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি ভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মি পাওয়া ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। ছবি তোলার কাজে যে আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করা হয়, সেটি বিভিন্ন বর্ণের আলোর মিশ্রণে উৎপন্ন সাদা আলো। প্রত্যেক বর্ণের আলোকের একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক আছে। সাদা আলো থেকে

কোন বিশেষ বর্ণের আলোককে বিচ্ছিন্ন করাও তখন সম্ভব হয়নি। তাই কোথায় পাওয়া যাবে সেই সব আলোকতরঙ্গ, যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান এবং যারা সমান তালে কম্পিত হবে ?

হাজার চেষ্টা করেও গাবর পারলেন না তার ঈপ্সিত আলোকতরঙ্গকে সাদা আলো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। তাঁর সিদ্ধান্ত কেবল সিদ্ধান্ত হিসাবেই গ্রহণ করল পদার্থবিজ্ঞান। ব্যবহারিক প্রয়োগ আর হল না। আর ত্রিমাত্রিক ছবি গঠন করার কল্পনা একরকম ঐখানেই চাপা পড়ে গেল।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন "লেসার" নামক পদ্ধতি। উক্ত পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে যখন নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি উৎপাদন করা সম্ভব হল, তখনই বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন গাবরের সিদ্ধান্তের প্রতি। ভাবলেন, গাবরের সিদ্ধান্তটা একবার খতিয়ে দেখা যাক না কেন ? যদি ত্রিমাত্রিক ছবি গঠন করা যায় ?

এ বিষয়ে প্রথম আগ্রহ বোধ করলেন মিশিগানের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। লেসারের সাহায্যে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিকে বিচ্ছিন্ন করে গাবরের পদ্ধতির সাহায্যে ছবি গঠনে হলেন যত্নবান। শেষপর্যন্ত বহু সাধ্যসাধনার পর হলোগ্রাম প্রস্তুত করে এক অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করলেন।

বিজ্ঞানীদের তৈরী হলোগ্রাম অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতই। ফিল্মের উপর লেসার রশ্মির সাহায্যে দৃশ্য বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব মুদ্রিত করা হয়। ফিল্মে কোন ছবিকে দেখা যায় না। যেমন গ্রামোফোন রেকর্ডকে হাতে করলে গান শোনা যায় না বা গানের ভাষাও পাঠ করা যায় না। যখনই গান শুনতে হয় তখনই যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

হলোগ্রামের ব্যাপার অনেকটা ঐ রকমই। আগে লেসার রশ্মির সাহায্যে মুদ্রিত হয় বস্তুর ছবি। তারপর দর্শকের সামনে উপস্থাপিত

করতে গেলেও সেই লেসারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অপরদিকে হলোগ্রাম তৈরীর জন্য পূর্বে যে ধরনের রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছিল, ছবি পুনরুদ্ধার করতে হলে সেই একই ধরনের রশ্মিকেই ব্যবহার করতে হয়। তবে মুদ্রণের সময় যে দিক থেকে ব্যবহার করা হয়, ছবি উদ্ধার করার সময় ব্যবহার করা হয় বিপরীত দিক থেকে। প্রতিবিম্ব যখন গঠিত হয় তখন আলোকের ব্যতিচার তথা ইনটার-ফিয়ারেন্সের নিয়ম অনুযায়ী। আর দর্শকের সম্মুখে যখন ধরা পড়ে তখন ডিফ্রাকশন বা বিচ্ছুরণের নিয়ম অনুযায়ী। এক কথায় হলোগ্রাম থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি দর্শকের চোখে গেলেই দর্শক বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে।

এই ধরনের ছবি নষ্ট না হওয়ার কোন ভয় থাকে না বলে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। হলোগ্রামের কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরুদ্ধার করা যায়। উক্ত কাজে ক্যামেরা, লেন্স, কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

আজকাল আবার আলোকতরঙ্গের পরিবর্তে শব্দতরঙ্গকে কাজে লাগিয়েও হলোগ্রাম তৈরী করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে বেড়েও চলেছে এর চাহিদা। অনেকের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে হলোগ্রামের সাহায্যে সিনেমার ছবি প্রস্তুত করার পদ্ধতিও আবিষ্কার করবেন বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে অনেকখানি এগিয়েও গেছেন তাঁরা। তখন কী মজাটাই না হবে? আমরা ফিল্মে দেখতে পাব একেবারে বাস্তবদৃশ্য। যেমন তোমরা সামনাসামনি বাবা, মা, স্কুলের মাষ্টারমশাই, বন্ধুবান্ধব, গাছ, লতা-পাতা, ফুল-পাখী প্রভৃতিকে দেখছো এবং প্রত্যেকের অবস্থান সম্বন্ধে ভালভাবে ধারণা করে নিচ্ছো, ঠিক তেমনটি। এতটুকু খুঁত কোথাও থাকবে না।

বিজ্ঞানীরা সবাই মনে করেন, হলোগ্রাফীর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। তাইতো উক্ত তত্ত্বের উদ্ভাবক অধ্যাপক ডানিস গাবরকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে।

ক্রোম্যাটোগ্রাফী

তোমরা দেখেছো, জবাফুলের রঙ টুকটুকে লাল, যেন মা কালীর পায়ের আলতা। আবার টগরের রঙ দুধের মত সাদা, গাছের পাতা মরকতমণির মত সবুজ। ফুল পাতা হাতে করলেই স্বভাবতঃ প্রশ্ন আসে জবার রঙ কেন লাল, টগর কেন সাদা, গাছের পাতা কেনই বা এমন সবুজ! সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তরও মনে আসে। ওদের রঙের মূলে আছে বিশেষ বিশেষ উপাদান। জবার বিশেষ উপাদানের গুণে লাল বর্ণের আলোটাকে প্রতিফলিত করতে পারে, টগর সাতটি রঙের আলোকরশ্মিকে প্রতিফলিত করে সাদা দেখায়, আর সবুজ পাতা সাতটি রঙের আলোকরশ্মির ছ-টিকে শুষে নিয়ে কেবল সবুজ বর্ণের আলোককে প্রতিফলিত করে।

কিন্তু কী তাদের উপাদান? মন ভোলানো বাহারে রঙের ফুলের ভেতরে কোন্ কোন্ পদার্থ লুকিয়ে থাকে? কোন্ পদার্থ থাকে সবুজ পাতার মধ্যে?

এককালে বিজ্ঞানীরা ওদের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করতে পারতেন না। বহু কঠিন কাজ সম্পন্ন করেও ঐখানে জীববিজ্ঞানীরা একরকম থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। যেমন সেই আরব্য উপন্যাসের আজ্ঞাবহ দৈত্য—যে বন কেটে নগর বসিয়েছিল, সাত রাজার ধনকে একত্র করেছিল, কিন্তু রাজকন্যার মাথার একগাছি কোঁকড়া চুলকে সোজা করতে গিয়ে হয়েছিল নাস্তানাবুদ।

বিজ্ঞানের রাজ্যটা আবার বড়ই অদ্ভুত। তুচ্ছ এক একটি পরীক্ষাকে অবলম্বন করেও বিজ্ঞান জগতে এসেছে মহাবিপ্লব। তুচ্ছ হাউই থেকে মহাকাশ বিদীর্ণকারী রকেট, ফ্যারাডের সেই তুচ্ছ তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের সূত্র থেকে ডায়নামো প্রভৃতি, ফুটন্ত জলের কেটলির ঢাকনাকে উঠতে পড়তে দেখে জেমস ওয়াটের বাষ্পীয়

শক্তি আবিষ্কার, এমনই কত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে বিজ্ঞানের রাজ্যে। তেমনই একটি তুচ্ছ পরীক্ষাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা জগতের প্রায় সব পদার্থকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশ্লেষণের পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে ক্রোম্যাটোগ্রাফী। রঙীন অথবা বর্ণহীন যে কোন তরল পদার্থের মিশ্রণ এবং জটিল যৌগের দ্রবণ প্রস্তুত করে নিয়ে সেই দ্রবণ থেকে যৌগটিকে বিচ্ছিন্ন করে তার উপাদান বিশ্লেষণ বা মিশ্রণকে পৃথকীকরণ, সব কিছুই উক্ত পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রোম্যাটোগ্রাফীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জীবকোষের জটিল যৌগিক পদার্থগুলির অস্তিত্ব নির্ধারণ এবং পৃথকীকরণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের একমাত্র হাতিয়ার ঐ ক্রোম্যাটোগ্রাফী। সত্য কথা বলতে কি, উক্ত পদ্ধতি যদি আবিষ্কৃত না হতো তাহলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞানীরা জীবকোষের নির্ভুল পরিচয় উদ্ধার করতে সমর্থ হতেন না। আর সমর্থ হতেন না কতকগুলো দুরারোগ্য রোগকে বিতাড়িত করতে। তুচ্ছ এক পরীক্ষা সত্ত্বেও আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন উক্ত পদ্ধতির গুরুত্বের কথা। তাই অনেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পরের দিকে পরীক্ষাটির উন্নত রূপ প্রদান করে দুই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে. পি. মার্টিন এবং রিচার্ড এল. এম. সাইঙ্গ লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার।

এবার শোন সেই ছোট্ট পরীক্ষাটির কথা।

এম. এস. সোয়েট নামে ছিলেন এক উদ্ভিদবিজ্ঞানী। গাছের মূল, পাতা প্রভৃতিকে নিয়ে সবসময় তিনি পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন। তোমরা জান, গাছের পাতা অনেক কাজ করে থাকে। শ্বাসকার্য চালায়। শরীরের অতিরিক্ত জলকে বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়। আমরা যেমন আমাদের দেহের বর্জ্য পদার্থকে মলমূত্র কিংবা ঘামের আকারে পরিত্যাগ করি, উদ্ভিদ সে রকমটি পারে না বলে কোন কোন উদ্ভিদ

আবার তাদের দেহের বর্জ্য পদার্থকে পাতায় সঞ্চয় করে রাখে। এসব ছাড়াও পাতার একটা বড় কাজ হচ্ছে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করা। পাতায় যে অসংখ্য সবুজকণা থাকে তারই মাধ্যমে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং সূর্যালোকের সাহায্যে প্রস্তুত করে খাদ্য—যা কোন জীব পারে না।

সোয়েট একদিন চিন্তা করলেন, পাতার ঐ সবুজ কণার উপাদান কী? কোন্ শক্তিতে সাধারণ তাপমাত্রায় সে এমন আশ্চর্যজনক কাজ সম্পন্ন করে থাকে? পাতার ঐ সবুজ অংশকে বিশ্লেষণ করা যায় না কী?

অনেক ভেবে চিন্তে একদিন তিনি কয়েকটা তাজা পাতাকে নিয়ে পেট্রোলিয়াম ইথারের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেন। পেট্রোলিয়াম ইথার ভাল দ্রাবক বলেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি। খনি থেকে প্রাপ্ত অশোধিত খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ামকে ত্রিশ থেকে সত্তর ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে পাতিত করলে এটিকে পাওয়া যায়। বর্ণহীন দ্রবণ। বিশেষত তেল কিংবা চর্বিকে দ্রবীভূত করতে বিজ্ঞানীরা ওরই সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন।

পেট্রোলিয়াম ইথারের মধ্যে গাছের পাতাকে ডুবিয়ে দেখলেন সোয়েট, সমস্ত সবুজকণাগুলো দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণের রঙটা গাঢ় সবুজ হয়ে গেল। পড়ে রইল কেবল পাতার কঙ্কাল। বহুদিন ধরে পাতাকে জল কাদার মধ্যে পুঁতে রাখলে কিংবা এঁদো পুকুর থেকে পাঁক তুললে যেমন কঙ্কালবিশিষ্ট পাতার অবয়বটা পাওয়া যায়, এ যেন অনেকটা তেমনই।

পাতার সবুজ অংশের একটা দ্রবণ প্রস্তুত করতে পেরে বেশ খুশিই হলেন সোয়েট। কিন্তু বিশ্লেষণ অথবা পাতার বিভিন্ন উপাদানগুলি পৃথক করবেন কেমন করে? কতদিন ধরে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন তিনি। অবশেষে কী যেন ভেবে একটা সরু চোঙের মধ্যে খড়ির গুঁড়া পুরে তার উপরেই ঢাললেন দ্রবণটা। দেখলেন

এক আশ্চর্য কাণ্ড! দ্রবণটা খড়ির গুঁড়া ভেদ করে যতই ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল ততই এক একটি স্তরের সৃষ্টি করতে লাগল। স্তরগুলির রঙ দেখেই চিনতে পারলেন। অতঃপর তিনি চোঙের ভেতর থেকে এক একটি স্তরকে সাবধানে ঠেলে বার করে আরম্ভ করলেন পরীক্ষা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাতার সবুজকণা বা ক্লোরোফিল হচ্ছে সবুজ রঙের জটিল রাসায়নিক পদার্থ। ঐটির জন্যই পাতার বর্ণ সবুজ। রাসায়নিক পরিচয়ের দিক থেকে এটি কেবল জটিল অণু নয়, একটি অতিকায় অণু। ঐ অতিকায় অণুর সহায়তায় গাছপালা জল ও বায়ুস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে জৈব বস্তুতে পরিণত করে।

সোয়েট কিন্তু উক্ত সত্য আবিষ্কার করতে পারেন নি কিংবা সবুজকণায় অতিকায় জটিল অণুর উপস্থিতিও টের পাননি। শুধু দ্রবণের স্তরবিন্যাসটাই লক্ষ্য করেছিলেন।

সোয়েটের পরীক্ষাটি রসায়নবিজ্ঞানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে অনেকদিন পরে। রসায়নবিজ্ঞানীরা যখন জৈব যৌগকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁদের দৃষ্টি পড়ে সোয়েটের পরীক্ষার উপর। বারবার পরীক্ষাটি করে দেখলেন এবং খড়ির গুঁড়ার পরিবর্তে অন্যান্য মাধ্যম খুঁজতে যত্নবান হলেন। অচিরে তেমন মাধ্যমের সন্ধানও পাওয়া গেল। ফলে কেবল গাছের পাতা নয়, অন্যান্য জৈব ও অজৈব পদার্থের দ্রবণ প্রস্তুত করে তাঁরা যে কোন পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করতে সমর্থ হলেন। তখনই উক্ত প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হল ক্রোম্যাটোগ্রাফী।

ক্রোম্যাটোগ্রাফী কথাটি নেওয়া হয়েছে গ্রীক শব্দ থেকে। গ্রীক ক্রোম্যা অর্থে রঙ এবং গ্রাফিন অর্থে আঁকা। যদিও শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ রঙীন পদার্থের পৃথকীকরণের কথাকে নির্দেশ করে তথাপি উক্ত পদ্ধতিতে রঙীন ও বর্ণহীন উভয় ধরনের দ্রবণকে বিশ্লেষণ করে পৃথক

করা হচ্ছে। তবে রঙীন দ্রবণ হলে আরও ভাল হয়। বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রঙের পদার্থগুলি আপনা হতেই পৃথক হয়ে পড়ে। উক্ত কারণে ক্রোম্যাটোগ্রাফী জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের একটা বিরাট অংশ জুড়ে বসে আছে। এক কথায় বিজ্ঞানের উপরোক্ত তিনটি শাখায় যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের সবাইকে ক্রোম্যাটোগ্রাফীর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়।

আজকাল আবার ক্রোম্যাটোগ্রাফীর বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তথাপি মূল পদ্ধতিটি সোয়েটের পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ। এখন খড়ির গুঁড়ার পরিবর্তে কাগজের টুকরা বা মোটা কাগজের চাদর, অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া, আয়ন বিনিময় রেজিনের গুঁড়া, সেলুলোজ পাউডার ইত্যাদি বহু পদার্থকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহৃত পদার্থের নাম বা চরিত্র অনুযায়ী ক্রোম্যাটোগ্রাফীর নামও বিভিন্ন। কাগজের গুঁড়া বা মোটা কাগজের চাদর ব্যবহার করলে বলা হয় পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফী। সরু কাচ নলে চারকোল, রেজিন, সেলুলোজ পাউডার ইত্যাদি ভর্তি করাকে বলা হয় কলাম প্যাকিং এবং উক্ত উপায়ে পৃথকীকরণ বা বিশ্লেষণ করাকে কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফী বলা হয়। তাছাড়াও "থিন লেয়ার" অল্প বিস্তারের স্তরযুক্ত ক্রোম্যাটোগ্রাফী, গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফী ইত্যাদি বহু ধরনের পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।

সোয়েট পদ্ধতিকে যাঁরা উন্নতরূপে প্রদান করেছেন তাঁরা হলেন দুই ব্রিটিশ রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ মার্টিন ও ডঃ সাইঙ্গ। এঁরা উভয়েই রাসায়নিক পদার্থসমূহকে বিশ্লেষণ করার সুষ্ঠু পদ্ধতির খোঁজখবর করেছিলেন। যদিও সে সময় বিশ্লেষণ করার একাধিক পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তবুও সব রকমের পদার্থকে বিশ্লেষণ করা যেত না। বিশেষ করে জৈব যৌগগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আগেকার পদ্ধতিগুলি কোন সন্তোষজনক ফল প্রদান করতো না। তাই তাঁরা অনুসন্ধান করেছিলেন কোন ভাল পদ্ধতির। ঠিক সেই সময় তাঁদের কর্ণগোচর

হয় প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী সোয়েটের পরীক্ষার কথা। মার্টিন ও সাইঙ্গ উভয়েরই মনে ধরল পরীক্ষাটি। আরও নিখুঁতভাবে পরীক্ষাটি করার জন্য খড়ির গুঁড়ার পরিবর্তে অন্য জিনিস খোঁজ করতে লাগলেন। শেষে দেখলেন, খড়ির গুঁড়ার বদলে কাগজের গুঁড়া ব্যবহার করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়।

মার্টিন ও সাইঙ্গ-এর পরীক্ষা প্রসঙ্গে আসার আগে মিশ্রণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এখানে মিশ্রণ বলতে কেবলমাত্র তরলের মিশ্রণের কথাই ধরতে হবে। যেসব মিশ্রণে তিন চার রকমের তরল মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তাদের পৃথক করার জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল কতকগুলি পাতনপদ্ধতি মাত্র। ওতেই তাঁরা একরকম কাজ চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এমন বহু মিশ্রণের সন্ধান পাওয়া গেল, যাদের ক্ষেত্রে পাতন পদ্ধতিগুলি কোন কাজই করতে পারল না। যদি মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পৃথক করা না গেল, তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেন?

মার্টিন ও সাইঙ্গ বহু চিন্তা ভাবনার পর সোয়েটের পদ্ধতির মতই সরু ও লম্বা একটি কাচের চোঙ গ্রহণ করলেন। তারপর কাগজের গুঁড়া দিয়ে খুব ঠাসাঠাসিভাবে ভর্তি করলেন। এবার গ্রহণ করলেন একটি তরলের মিশ্রণ, যাতে দুয়ের অধিক উপাদান আছে। সেই উপাদানগুলি এমন যে, কোন একটি মাত্র দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না। প্রত্যেককে দ্রবীভূত করতে পৃথক পৃথক দ্রাবকের প্রয়োজন।

প্রথমে একটি দ্রাবককে চোঙে ঢাললেন। দ্রাবকটি কাগজের গুঁড়া ভেজাতে ভেজাতে নিচে নেমে গেল। এবার যে মিশ্রণটি থেকে তার উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করবেন, তাকেই ঢাললেন চোঙের মুখে। মিশ্রণটিও পূর্বের মত ধীরে ধীরে নামল নিচে। কিন্তু একটি উপাদান তাকে হারাতে হল। কারণ, পূর্বে যে দ্রাবকটিকে ঢেলেছিলেন সেটি কাগজে আটকে থেকে ছিল বলে মিশ্রণের বিশেষ একটি উপাদানকে দ্রবীভূত করে নিল। বাদবাকিরা মিশ্রণেই থেকে গেল।

তারপর ঢাললেন দ্বিতীয় আর একটি দ্রাবক, যে মিশ্রণের দ্বিতীয় উপাদানটিকে দ্রবীভূত করে নিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। অবশেষে তৃতীয় দ্রাবক।

এবার প্রথম দ্রাবক বেশি পরিমাণে ঢেলে সংগ্রহ করলেন চোঙের তলা থেকে। একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রাবককেও বেশি পরিমাণে ঢেলে সবাইকে সংগ্রহ করে নিলেন। যে দ্রবণগুলি লাভ করলেন, তাতে মাত্র একটি করেই উপাদান ছিল। যাকে সনাক্ত করতে আদৌ বেগ পেতে হল না। উক্ত পদ্ধতিতে কোন কঠিন যৌগকে উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত করে পৃথক করে নিতেও বিশেষ অসুবিধা হল না। অপরদিকে রঙীন তরলকে ঢালতে নানা স্তরবিন্যাসও দেখতে পেলেন।

মার্টিন ও সাইঙ্গের পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল রাতারাতি। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানীরা। অপরদিকে মার্টিন নিজেই উক্ত পদ্ধতিটির উন্নতরূপ দান করতে হলেন যত্নবান। অত্যল্পকালের মধ্যে আবিষ্কার করলেন একাধিক পদ্ধতি। ফলে জৈব যৌগগুলির জটিল ও অতিকায় অণুগুলিকে পৃথক করা সম্ভব হল।

মার্টিন কাগজের গুঁড়ার পরিবর্তে মোটা কাগজের চাদর ব্যবহার করেও ভাল ফল পেয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন ডিসেণ্ডিং পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফী এবং অ্যাসেণ্ডিং পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফী। উভয় পদ্ধতিতে একটা মোটা কাগজের চাদর দ্বারা উপর থেকে অথবা তলা থেকে তরলের মিশ্রণকে চুঁইয়ে নেওয়াই ছিল মুখ্য বিষয়।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। লেখা কালির উপর এক টুকরো ব্লটিং কাগজের একটি প্রান্ত আলতোভাবে ছোঁয়ালে দেখা যায়, তিনটে স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। সবার উপরে জল, তার তলায় হালকা রঙের কালি, একেবারে তলায় শোষিত কালির রঙ বেশ গাঢ়।

ক্রোম্যাটোগ্রাফীর বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় রঙীন, বর্ণহীন,

প্রতিপ্রভ, তেজস্ক্রিয়, সব রকমের পদার্থকে পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। ডঃ সাইঙ্গ ক্রোম্যাটোগ্রাফীর দ্বারাই প্রথম প্রোটিনের মূল উপাদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, প্রোটিন অণুর মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি একটা নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে পর পর সজ্জিত থাকে। সেদিন বিজ্ঞান সাইঙ্গের এই আবিষ্কারটিকে যুগান্তকারীরূপে আখ্যা প্রদান করেছিল। তৎসহ তাঁদের ক্রোম্যাটোগ্রাফীকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী। দুই আবিষ্কারককেও সম্মান জানানো হয়েছিল নোবেল পুরস্কার প্রদান করে।

সত্য কথা বলতে কি, জীবনের মূল উপাদান আবিষ্কারের পেছনে আছে ক্রোম্যাটোগ্রাফীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। উক্ত পদ্ধতি আবিষ্কারের মাত্র দুবছরের মধ্যেই আশ্চর্যজনক বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা এবং এখনও করছেন। ক্রোম্যাটোগ্রাফীর সাহায্যে প্রথম জীবদেহের রাসায়নিক কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে জিনের ভূমিকা আবিষ্কার করেছিলেন বিড্‌ল, টাটুন ও লেডারবার্গ। পরের বছরই ডি. এন. এ এবং আর. এন এ-র সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন কনবার্গ এবং ওকোয়া। তার মাত্র কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনেটিক কোডের ব্যাখ্যা প্রদান করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন খোরানা, হোলি এবং নিরেনবার্গ।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ক্রোম্যাটোগ্রাফী ধীরে ধীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উক্ত পদ্ধতির দ্বারা মানুষের রক্ত, মূত্র প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করে এবং উপাদানগুলিকে পৃথক করে শরীরে কোন্ কোন্ জিনিসের ঘাটতি অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে আছে, তা অতি সহজেই নির্ণয় করা যাচ্ছে। ফলে সুস্থ ও নীরোগ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ক্রোম্যাটোগ্রাফী। রক্ত, মূত্র ইত্যাদির ক্রোম্যাটোগ্রাফ করে চিকিৎসকরা মানসিক রোগগ্রস্ত এবং জড়দের চিকিৎসার উপায়ও আবিষ্কার করেছেন।

জীবের উৎপত্তি

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, দুধকে রেখে দিলে দইতে পরিণত হয়। সেই দইকে যদি আরও কয়েকটা দিন পরে পরীক্ষা কর, তাহলে দেখতে পাবে উপরে এক ধরনের সাদা সাদা ছাতা গজিয়েছে এবং কিলবিল করছে অসংখ্য লম্বা লম্বা পোকা।

কেবল দই নয়, মাখন কিংবা এক টুকরো মাংসকেও খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে কোথা থেকে সাদা সাদা পোকার আমদানি হয়। পচা গোবরে কিংবা নর্দমার পচা পাঁকে যেন আপনা থেকেই উদ্ভব হয় হরেক রকমের পোকার।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি লক্ষ্য করে প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা হয়েছিল ছোট ছোট জীবরা আপনা হতেই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ ওদের কোন পূর্বপুরুষ নেই। প্রাচীন মিশর আবার মনে করতো, যে কোন সাপ কাদা থেকেই উৎপন্ন হয়। গ্রীকরা ভাবতো, ইঁদুরের জন্ম আবর্জনা স্তূপ থেকে।

মধ্যযুগেও মানুষের মন থেকে পূর্বের ধারণা একেবারে মুছে যায়নি। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনেক বিজ্ঞানী মনে: করতেন, উন্নত জীবগোষ্ঠী না হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুরা স্বয়ং সৃষ্ট। জলে কিছু কিছু মাছও আপনা হতে জন্মগ্রহণ করে। তবে এগুলো ছিল সেকালে মানুষের ধারণা মাত্র। কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করেই উক্ত ধারণা পোষণ করতেন।

জীবাণু সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষার আয়োজন করেন নীডহাম নামে জনৈক ধর্মযাজক। জীবাণুরা স্বয়ং সৃষ্ট, এই মতবাদের তিনিও একজন সমর্থক ছিলেন। মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই একটি বাস্তব পরীক্ষার অবতারণা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষাটি ছিল নিম্নরূপ—

নীডহাম প্রথমে একটি বড় বোতলের অর্ধাংশ জলে ভর্তি করে জলটাকে ভালভাবে ফুটালেন। তারপর বোতলের জল ফেলে দিয়ে এক টুকরা গরম মাংসকে বোতলে পুরে ছিপি এঁটে দিলেন। এই অবস্থায় বোতলটিকে ফেলে রাখলেন বেশ কয়েকটা দিন। তারপর ছিপি খুলে মাংস খণ্ডটি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে। যেহেতু বোতলে জলকে ফুটিয়ে বোতলকে জীবাণুমুক্ত করেছিলেন এবং গরম অবস্থায় তার মধ্যে মাংসের টুকরো পুরে দেওয়ায় মাংসেও কোন জীবাণু থাকার সম্ভাবনা ছিল না। অপরপক্ষে বোতলের ছিপি ভালভাবে এঁটে দেওয়ায় বাহির থেকে জীবাণু আসার পথও বন্ধ ছিল। নীডহামের প্রশ্ন এল, মাংসে পোকা এল কোথা থেকে? এ বিষয়ে তিনি আরও অনেক চিন্তা করলেন। অবশেষে ঘোষণা করলেন, জীবরা আপনা হতেই জন্মগ্রহণ করে। ওদের কোন পূর্বপুরুষ নেই।

নীডহামের পরীক্ষার কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। বিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই মেনে নিলেন তাঁর কথা। কেবল স্বীকার করলেন না একজন দার্শনিক। প্রথম থেকেই তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, জীবাণুরা স্বয়ং সৃষ্ট হতে পারে না। উন্নত জীবের মত তাদেরও পূর্বপুরুষ আছে। তবে তৎক্ষণাৎ সেই দার্শনিকটি বিরোধিতা করলেন না নীডহামের। নতুন করে পরীক্ষা করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

দার্শনিকটি করলেন কি, সরু মুখওয়ালা গুটি দশেক বড় ও মোটা বোতল সংগ্রহ করলেন। তারপর প্রত্যেকটি বোতলে রাখলেন কিছু পরিমাণ জল এবং কতকগুলো জীবাণু। অতঃপর বোতলগুলির প্রত্যেকটিকে গরম করে জলকে ভালভাবে ফুটালেন। যখন জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে আরম্ভ করল, তখনই পাঁচটি বোতলের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করলেন এবং অপর পাঁচটির মুখ আগুনে গলিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। দার্শনিক এবার

বোতলগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলেন। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, যে পাঁচটি বোতলের মুখ আগুনে গলিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাদের কোনটিতে জীবের উদ্ভব হয়নি। অথচ কর্কের ছিপি দিয়ে বন্ধ করা প্রত্যেকটি বোতলে অল্প বিস্তর জীব এসে বাসা বেঁধেছে।

দার্শনিকের সন্দেহ দূরীভূত হল। বুঝতে পারলেন, কর্ক দিয়ে বন্ধ করা বোতল সম্পূর্ণরূপে বায়ুনিরুদ্ধ হয় না। তাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুরা অক্লেশে কর্কের ভেতর দিকে ঢুকে পড়েছে বোতলের মধ্যে। অপরপক্ষে আগুনে গলিয়ে বন্ধ করা বোতল সম্পূর্ণরূপে বায়ুনিরুদ্ধ হওয়ায় জীবাণুর প্রবেশ ঘটতে পারেনি।

দার্শনিক এবার জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, জীব আপনা হতে জন্মায়—মানুষের এই চিরাচরিত ধারণা একেবারেই ভুল। জীবাণুদেরও পূর্বপুরুষ আছে। তবে ওরা এমন সূক্ষ্ম যে, ওদের খালি চোখে একেবারেই দেখা যায় না এবং সবসময় ওরা বায়ুতেই ভেসে বেড়ায়।

দার্শনিক তাঁর মতবাদ প্রচার করলে চারদিকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল। কিন্তু নীডহাম তাঁকে সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না। শোনামাত্রই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন। চলতে লাগল পরীক্ষার পর পরীক্ষা। উভয়ের মতবাদকে যাচাই করার জন্যও এগিয়ে এলেন অনেক বিজ্ঞানী। অবশেষে বিজ্ঞানীরা দার্শনিকের কথাই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

উক্ত দার্শনিকের নাম ল্যাজারো স্প্যালানজেনি। বিজ্ঞানী না হয়েও এক মহান বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজ্ঞান জগতে তিনি অমর হয়ে আছেন। তবে তাঁর পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাঁর মতে মত প্রকাশ করতে পারেন নি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও উদ্ভূত হয়েছিল সেই একই গুঞ্জন। অর্থাৎ জীব আপনা থেকেই জন্মগ্রহণ করে। এই মতের জোরালো

সমর্থকদের মধ্যে একজন ছিলেন লুই পাস্তুরের সমসাময়িক পাউসেট নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। তিনি স্প্যালানজেনির পরীক্ষার কথা সবই শুনেছিলেন। কিন্তু আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাই অন্য আর এক ধরনের পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি।

পাউসেটের পরীক্ষার অবশ্য একটু নতুনত্ব ছিল। প্রথমে তিনি একটি ফ্লাস্ককে জলে পূর্ণ করে ভালভাবে ফুটালেন। তারপর ফ্লাস্কটিকে উপুড় করে রাখলেন পারদের উপর। এই অবস্থায় বাঁকানো কাচ নলের মাধ্যমে কিছুটা সদ্যপ্রস্তুত অক্সিজেন গ্যাসকে ঢোকালেন ফ্লাস্কের জলকে অপসারিত করে। অবশেষে একটা জীবাণু-শূন্য খড়কেও প্রবেশ করালেন ফ্লাস্কের মধ্যে। তারপরে ফ্লাস্কের মুখ ভালভাবে ছিপি দিয়ে বন্ধ করে যত্ন করে রেখে দিলেন ঘরের মধ্যে।

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই পাউসেট দেখলেন বোতলের জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সামনে পেতে ধরলেন সেই জলের দু-এক ফোঁটা। দেখলেন, এখানেও জীবাণু। পুনরায় তিনি মানুষের আগের সেই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং লুই পাস্তুর। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন, পাউসেট যে পারদ ব্যবহার করেছিলেন তাতে ছিল অসংখ্য ধূলিকণা এবং সেই ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ছিল রাজ্যের যত জীবাণুরা। আর যে খড়টিকে পাউসেট ব্যবহার করেছিলেন সেটিও জীবাণুমুক্ত ছিল না।

জীবাণু সম্বন্ধে লুই পাস্তুর দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর সব পরীক্ষাই প্রমাণ করেছিল, একমাত্র জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। পাস্তুর আরও প্রমাণ করেছিলেন, বায়ুতেই বাস করে নানা জাতের জীবাণু। দুধ, মাখন, রান্না করা জিনিস প্রভৃতি টকে যাওয়ার মুলে আছে বাতাসের জীবাণুদের আক্রমণ ও প্রতিক্রিয়া। ওদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

প্রকৃতপক্ষে জীব থেকে জীবের উৎপত্তি—উক্ত সত্যটির আবিষ্কর্তা পাস্তুর না হলেও সত্যটির প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। অপরদিকে জীবাণু

সম্বন্ধে এত মূল্যবান তথ্য পাস্তুরের আগে কেউ প্রদান করতে পারেন নি। একরকম তাঁরই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে উত্তরকালে জীবাণু-সংক্রমণ রোধ করার উপায়গুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই পাস্তুরের কোন তুলনা হয় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষী বিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি।

জীবের উৎপত্তি বিষয়ে স্প্যালানজেনি এবং পাস্তুরের মতবাদগুলি জাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ বিশেষ। তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। জীব থেকে জীবের সৃষ্টি হয়, জীবাণুরও পূর্বপুরুষ আছে, সব কথাই ঠিক। কিন্তু সেই আদিকালে পৃথিবীর বুকে জীব এসেছিল কোথা থেকে?

প্রথম জীবের বৈশিষ্ট্যের কথা একটু আলোচনা করে পূর্বের প্রসঙ্গে আসা যাবে। জীব বলতে ন্যূনপক্ষে একটি কোষ দ্বারা গঠিত দেহ। এর অপরিহার্য উপাদান নিউক্লিও প্রোটিন, যা জীবকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম-এ বর্তমান থাকে। এমনকি অতি ক্ষুদ্র জীব ভাইরাস ও ব্যাকটিরিও-ফাজের দেহেও নিউক্লিও প্রোটিন অণু বর্তমান।

নিউক্লিও প্রোটিনের গঠন আবার অত্যন্ত জটিল। তবে দেখা গেছে, নিউক্লিও প্রোটিনের অণুতে প্রধানতঃ দুটি অংশ থাকে—প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড। প্রোটিন অংশে থাকে প্রোটামিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড অংশটি অনেকগুলি নিউক্লিওটাইড অণুর সমষ্টি। নিউক্লিওটাইড আবার ফসফরিক অ্যাসিড ও কয়েক রকমের নিউক্লিওসাইড নিয়ে তৈরি। অন্যদিকে ওই নিউক্লিওসাইডে থাকে পিউরিন জাতীয় ক্ষারক এবং রাইবোজ অথবা ডি-অক্সিরাইবোজ নামক সরল শর্করা।

বিজ্ঞানীদের মতে কোষ মধ্যস্থিত নিউক্লিও প্রোটিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। কোষের নিউক্লিয়াসে আবার ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. নামক দু ধরনের

নিউক্লিক অ্যাসিড যুক্ত দু রকমের নিউক্লিও প্রোটিন পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে ঐ ডি. এন. এ. ঘটিত নিউক্লিও প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। আর. এন. এ. ঘটিত নিউক্লিওপ্রোটিন কিন্তু নিউক্লিয়াসে অল্প অথচ সাইটোপ্লাজমে থাকে অধিক। ওরা নিজেদের আণবিক গঠনের ছাঁচে নিউক্লিও প্রোটিন অণু প্রস্তুত করে থাকে।

জীবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তার কোষবিভাজন। বিভাজনের সময়ে ডি. এন. এ থেকে অনুরূপ ডি. এন এ. উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ডি. এন. এ.-র পরিমাণ বাড়লেই কোষবৃদ্ধি হয়। প্রতিটি কোষে মোটামুটিভাবে ডি. এন এ.-র পরিমাণ নির্দিষ্ট। কোন কোন ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র ভাইরাসের মধ্যে আবার ডি এন. এ. নেই। সেখানে কেবল থাকে আর এন. এ.। এই আর. এন এ.-র অনুরূপ আর. এন. এ. তৈরি করেই তারা বংশ বিস্তার করে।

উপরোক্ত আবিষ্কারগুলি থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে, জীবনের মূলে আছে নিউক্লিক অ্যাসিড নামক রাসায়নিক পদার্থটি। সাম্প্রতিক-কালের গবেষণা থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে ঐ নিউক্লিক অ্যাসিডই জীবনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। জীবনের স্ফুরণ, আকৃতি-প্রকৃতি দোষগুণ সব কিছুই নির্ভর করে নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত জীন নামক দেহকোষের বস্তুটির উপর।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, জীবনের মূল যে জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলির অণু—তারা যদি কোন বিশেষ পরিবেশে আকস্মিকভাবে মিলিত হয় তাহলে একটি জীবকোষের জন্মকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমনটি পৃথিবীর আদিতেই ঘটেছিল বলে অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এমন একদিন ছিল—যেদিন পৃথিবীর বুকে ছিল না কোন জীব অথবা কোন উদ্ভিদ। সেদিন তার তাপমাত্রা ছিল আজকের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প প্রভৃতি ছিল নিত্য সহচর। সেই অশান্ত পৃথিবীর বুকে উপদানগুলির

অণুপরমাণুর রাসায়নিক মিলন ও বিয়োজনও চলেছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ায়ই হয়ত আকস্মিকভাবে গঠন করে নিয়েছিল জীবনের উপাদান জটিল জৈব অণুগুলি। এক কথায় জড়ের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল প্রাণের সঞ্চার। উদাহরণস্বরূপ ভাইরাস নামক প্রাণময় অণুর কথাই উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানীরা। ওরা জীব ও জড় উভয় অবস্থায়ই অবস্থান করতে পারে। যদিও জীব হিসাবে ওদের গণ্য করা হয় না।

জীব আপনা থেকে তথা জড় পদার্থ থেকে যে পূর্বে উৎপন্ন হয়নি, অথবা এখনও যে জীবাণুরা জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় না, একথা জোর দিয়ে বলা বোধহয় উচিত হবে না। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি করতে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে আকস্মিকভাবে জড় পদার্থের অণুগুলোর মিলনে জীবাণুরা জন্মগ্রহণ করতে পারে—এই সত্যটিকেও স্বীকার করতে হবে।

কৃত্রিম সব্‌জী চাষ

এক ছিলেন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর জ্যাঁ বোসিগলং। ফ্রান্সের লোক। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসাবে ছিল দেশজোড়া সুনাম।

একদিন ভাবলেন বোসিগলৎ, গাছ তো আর মাটি খায় না! মাটিতে যে সব রাসায়নিক লবণ ও খনিজ পদার্থ থাকে, তারই জলীয় দ্রবণকে গ্রহণ করে মাত্র। তারপর বাতাস থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে সূর্যরশ্মির সাহায্যে পাতায় কার্বোহাইড্রেট গঠন করে। আর মাটিটা গাছকে না হয় শক্তভাবে খাড়া করে রাখছে এবং মাটিতে মিশে থাকা খাদ্যোপাদানগুলিকে সরবরাহ করছে। অন্যভাবে যদি গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলিকে যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে মাটির দরকারটা কী? খুব বড় বড়

গাছের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু ছোট ছোট গাছ তথা শাকসবজীকে বিনা মাটিতে কী চাষ করা সম্ভব নয় ?

বোসিগলৎ তখনই লেগে গেলেন কাজে। প্রথমে ভেবে দেখলেন, গাছের খাদ্যোপাদানগুলি সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তা না হলে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

রাতদিন ধরে চললো পড়াশোনা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা অবশ্য অনেক আগেই সে সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেছিলেন। বোসিগলৎ কেবল যাচাই করে দেখতে লাগলেন মাত্র। বুঝতে পারলেন, বিজ্ঞানীদের কথাই ঠিক। জল ব্যতীত গাছের জীবনধারণের জন্য অন্ততঃ ছ'টি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন। সেগুলি যথাক্রমে কারবন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার ও ফসফরাস।

উপরোক্ত মৌলিক পদার্থগুলি ছাড়া স্বল্প পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, পটাসিয়াম প্রভৃতিরও দরকার হয়ে থাকে। আবার কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদের জন্য সোনা, মলিবডেনাম, ভ্যানেডিয়াম, বোরণ, তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, আয়োডিন প্রভৃতির একটি কিংবা দুটির অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিদের তো আর দাঁত নেই যে চিবিয়ে খাবে ? তাই উপরোক্ত পদার্থগুলিকে গ্যাসীয় বা কঠিন অবস্থায় প্রয়োগ করলে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে না। জলে দ্রবণীয় ওদের যৌগিক পদার্থকে প্রয়োগ করলেই গ্রহণ করতে পারবে সে।

এবার বোসিগলৎ-এর আরম্ভ হল পরীক্ষা। একটা লোহার ট্রে তৈরি করে তাতে রাখলেন কিছুটা পাথরকুচি ও বালি। তারপর ঐ পাথরকুচি ও বালির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন, যে উদ্ভিদ তিনি চাষ করবেন তারই প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলি। পরিশেষে কয়েকটি চারাগাছ রোপন করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলেন এবং প্রয়োজনীয় জল ও সূর্যকিরণের ব্যবস্থা করলেন।

তোমরা অবশ্যই জানো, পাথর ক্ষয় হয়ে মাটির উৎপত্তি হলেও

পাথরকুচি, বালি ও মাটি এক জিনিস নয়। মাটিতে থাকে হিউমাস নামে বিশেষ উপাদান। মাটির জল শোষণ করার ক্ষমতা আছে। পাথরের আদৌ নেই। তাছাড়া বোসিগলৎ পাথরকুচি এবং বালি নিতান্ত কম পরিমাণেই গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, গাছগুলো যাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কাৎ হয়ে পড়লে খাদ্য ঠিকমত প্রস্তুত করতে পারবে না এবং বৃদ্ধিও হবে ব্যাহত।

অদ্ভুত ফল পেলেন বোসিগলৎ। ট্রের চারাগাছগুলো তরতর করে বেড়ে চললো। দিনে দিনে এমন সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠল যে, মাটিতে চাষ করে যথোপযুক্তভাবে পরিচর্যা করলেও অনেক সময় এমনটি হয় না। বোসিগলৎ অবশ্য হিসেব করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলি যোগান দিয়ে যেতেন। শেষে একদিন ঐ ট্রের গাছেই এল ফুল এবং ফুল থেকে ফলও পাওয়া গেল। বিনা মাটিতেই শূন্যোদ্যান তৈরি করে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিলেন বোসিগলৎ।

বোসিগলৎ-এর চাষের পদ্ধতি অনেক বিজ্ঞানীকে উদ্বুদ্ধ করল। তবে নিন্দুকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। সব শুনে তারা বললো, মাটি না হয় ব্যবহার করেননি বোসিগলৎ। কিন্তু পাথরকুচি আর বালি ব্যবহার করেছেন তো? যদি এই দুটিকে বাদ দিয়ে বাগান বানাতে পারতেন, তাহলেই কৃতিত্বের দাবী করতে পারতেন। এ আর এমন কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ?

জুলিয়ান ফন্ স্যাক্স নামে একজন জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী বোসিগলৎ-এর পরীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পদ্ধতির অভিনবত্ব তাঁকে মুগ্ধও করেছিল। কিন্তু নিন্দুকদের কথা শুনে হতাশ না হয়ে পারলেন না। সেই সঙ্গে পাথরকুচি এবং বালিকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে চাষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তবে গাছকে সোজা করে ধরে রাখবার জন্য একটা মাধ্যম চাইতো!

শুরু হল স্যাক্স-এর চিন্তাভাবনা। অবশেষে স্থির করলেন,

জলের উপরেই চাষ করবেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রহ করলেন দুধের বোতলের মত বড় মুখওয়ালা কয়েকটি বোতল। বোতলগুলির গলা পর্যন্ত জলে পূর্ণ করে সেই জলে মিশিয়ে দিলেন গাছের খাবার। তারপর কয়েকটি ছোট ছোট চারাগাছ এনে তাদের এক একটির শেকড় এক একটি বোতলের জলে ঝুলিয়ে রাখলেন এবং চারাকে খাড়া করে রাখলেন বোতলের মুখে ছিদ্রবিশিষ্ট নরম কর্কের ছিপির মাধ্যমে। অর্থাৎ ছিপির নিচে জলের মধ্যে থাকল মূল আর উপরে থাকল চারা গাছের অন্যান্য অংশ।

এক্ষেত্রেও দেখা গেল, চারাগাছের বৃদ্ধি আদৌ ব্যাহত হল না। বরং মাটিতে রোপিত চারা অপেক্ষা বৃদ্ধি হল দ্রুত। স্যাক্স প্রতিটি বোতলের ছিপিতে আরও দুটি করে ছিদ্র রেখেছিলেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাইফনের সাহায্যে ভেতরের জলটাকে বার করে নিতেন এবং অপর ছিদ্রপথে নলের সাহায্যে নতুন করে খাদ্য গোলা জল প্রবেশ করাতেন।

বোসিগলৎ-এর মত স্যাক্সও কৃতকার্য হলেন। তিনি অবশ্য মটরের চারা রোপন করেছিলেন। সেই চারাগাছ বড় হয়ে ফুল ও ফলে ভরে গেল। চমৎকৃত হলেন স্যাক্স এবং আশ্চর্য বোধ করলেন সমস্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। নিন্দুকদের মুখগুলোও একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্য। তারপর তাদের গলা থেকে ভেসে এল অন্য স্বর। বললো, বিনা মাটিতে চাষ হতে পারে স্বীকার করলাম। কিন্তু খরচের অঙ্কটা? একটা মটর গাছ থেকে যে পরিমাণ মটর পাওয়া যাচ্ছে, তার একশ' গুণ হচ্ছে খরচ। অতএব মানুষের কোন্ প্রয়োজনে লাগবে এই পদ্ধতি? ধনী ও সৌখিন ব্যক্তিরা পদ্ধতিটিকে তাদের বিলাসোপকরণ হিসাবে লুফে নিতে পারে। এর থেকে সাধারণ মানুষের এতটুকু উপকার হবে না, আর পারবে না খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করতে।

নিন্দুকের কথার মূলে অবশ্য যুক্তি ছিল। তবে খরচের কথা

কেবল চিন্তা করলে পৃথিবীতে বোধহয় কোন আবিষ্কারই হতে পারত না। এক কথায় সেই আরণ্যক জীবনেই চিরকাল মানুষকে পড়ে থাকতে হত। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে তাঁরা। আপন খেয়ালে কাজ করেন। ফলের কথা চিন্তাও করেন না। তাই সেদিনের সেই ছোট্ট পরীক্ষাগুলির প্রতি অনেকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেও বিজ্ঞানীরা আদৌ অবহেলা করলেন না। বরং উক্ত পদ্ধতির উন্নত রূপ প্রদানে যত্নবান হলেন এবং ব্যবহারিক রূপ প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। শেষে-জয়যুক্ত হলেন কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

তাঁরা স্যাক্স-এর পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে বোসিগলৎ-এর পদ্ধতিকেই গ্রহণ করলেন। তৈরি করলেন কতকগুলো কংক্রিটের অগভীর চৌবাচ্চা। বালি ও পাথরকুচির পরিবর্তে রাখলেন টুকরা টুকরা পাথর। জলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান মিশ্রিত করে ঢাললেন চৌবাচ্চায়। তারপর কোনটিকে বপন করলেন টম্যাটোর বীজ, কোনটিতে কপির বীজ, কোন কোনটিতে লাউ কুমড়োর বীজ ইত্যাদি। পূর্বোক্ত বিজ্ঞানীদের মত এঁরাও যথাসময়ে এবং নিয়মিত-ভাবে খাদ্য প্রয়োগ করে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে প্রতিটি চৌবাচ্চা এক একটি সব্‌জি বাগানে রূপান্তরিত হল। পাওয়া গেল শাক, মটরশুঁটি, টম্যাটো, কপি, লাউ, কুমড়া, সবই। তবে খরচটা বেশি পড়ল।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু খরচের কথা আদৌ চিন্তা করলেন না। বরং অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাঁরা অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত উক্ত পদ্ধতিতে একটা বড় কমলালেবুর গাছকেও উৎপন্ন করলেন এবং লাভ করলেন প্রচুর কমলা।

প্রকৃতপক্ষে এতদিনে কৃত্রিম সব্‌জী চাষের পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের গবেষণাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মধ্যে।

অবশ্যই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা আকর্ষণ বোধ করেছিলেন সর্বাধিক। তাঁরা ঘরের ছাদে স্থাপন করলেন চৌবাচ্চার পর চৌবাচ্চা। বাড়ীর চিলেকোঠা পরিণত হল সব্জী বাগানে। কেবল তাই নয়, একতলা কিংবা দোতলার ঘরে উপযুক্তভাবে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়েও চৌবাচ্চায় চাষ করতে সমর্থ হলেন। প্রমাণিত হল, বিনা মাটিতে এবং ঘরের ভেতরেও শাকসব্জি উৎপন্ন করা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়।

বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত কৃত্রিম সব্জি চাষের অভিনব পদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গে যে জনপ্রিয়তার চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল, এমন নয়। একরকম সীমাবদ্ধ ছিল তাঁদের গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে। আর কিছু কিছু অর্থশালী ব্যক্তি পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করেছিলেন সখ সৌখিনতার জন্য। ব্যয়বহুল এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। অর্থাৎ সেই নিন্দুকদের কথাই ঠিক হল।

কিন্তু দিন কারও সমান যায় না। দীর্ঘকাল অবহেলা ও অনাদরের মধ্যে কালযাপন করার পর দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের সময় ওরই পড়ল ডাক। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ই কৃত্রিম সব্জী চাষের পদ্ধতি পৃথিবীর জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল। এতকাল সে ছিল গোপনচারী। উন্মুক্ত অঙ্গনে পদার্পণ করা মাত্রই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে এবং মুগ্ধ হল ওর অভিনবত্ব দেখে। ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক।

তখন পুরোদমে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর। যেখানে সেখানে, পাহাড়ের কোলে, জঙ্গলের মধ্যে, মরুভূমির বুকে ছাউনি ফেলে আছে হাজার হাজার সৈন্য। কাছে পিঠে লোকালয় নেই। নেই যোগাযোগ কিংবা যানবাহনের ব্যবস্থা। কপালে কেবলমাত্র শুকনো খাবার ছাড়া অন্য কিছু জোটেনা। মাসের পর মাস সেই একই শুকনো খাবার খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। টাটকা শাকসব্জী না পেয়ে অসুখও ধরে গেছে অনেকের।

সৈন্যদের সঙ্গে যে সব চিকিৎসক ছিলেন তাঁরা কর্তৃপক্ষকে জানালেন, এইভাবে সবসময় শুকনো খাবার খেতে থাকলে সৈন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যে কোন উপায়ে ওদের টাটকা ফল ও শাকসব্জী সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন কর্তৃপক্ষ। শ' শ' মাইল অভ্যন্তরে মরুভূমির বুকে কেমন করে প্রেরণ করা যাবে টাটকা খাবার? তাও যদি মাসে এক-আধবার হত। এ যে প্রতিদিন পাঠাতে হবে?

দেশের রথী-মহারথীরা যখন ভেবে কুলকিনারা করতে পারলেন না, তখন মুস্কিল আসান করতে ডাক পড়ল বিজ্ঞানীদের। বললেন রাষ্ট্রনায়করা, "আপনারা তো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করছেন। এবার মরুভূমির বুকে সৈন্যদের টাটকা শাকসব্জি সরবরাহ করার একটা উপায় বার করুন দেখি!"

বিজ্ঞানীরা একগাল হেসে বললেন, "এ আর এমন কি কঠিন কাজ! টাকা পেলে মরুভূমির বুকটাও সবুজে সবুজে ভরিয়ে তুলতে পারি আমরা।"

বিজ্ঞানীদের কথা শুনে রীতিমত বিস্মিত হলেন রাষ্ট্রনায়কগণ। জিজ্ঞাসা করলেন, "এত জল পাবেন কোত্থেকে? না কি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পাইপে করে জল আনবেন?"

বিজ্ঞানীরা এবারও হাসলেন। বললেন, "তার জন্য আদৌ চিন্তা করতে হবে না আপনাদের। আমরা যে পদ্ধতিতে চাষ করব, তাতে জল অল্পই দরকার হবে। আর যতটুকু দরকার হবে, তার সবটুকুই সংগ্রহ করে নেব ঐ মরুভূমির বুক থেকে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাষ্ট্রনায়কগণ। আর বিজ্ঞানীরাও গৌরী সেনের টাকা হাতে নিয়ে ছুটলেন মরুভূমির বুকে। সঙ্গে কিছু কিছু লোকলস্কর এবং যন্ত্রপাতিও গেল। মরুভূমির বুক থেকে আহরণ করা হল উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান। আর কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিজ্ঞানীদের পদ্ধতি অনুযায়ী স্থাপন করা হল শত

শত কংক্রিটের চৌবাচ্চা। মাস খানেকের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা সৈন্যদের উপহার দিলেন যথেষ্ট শাকসব্‌জি। টম্যাটো প্রভৃতি ফলও উৎপাদন করলেন প্রচুর। খুশির জোয়ার বলে গেল সৈনিকদের মনে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর একদিন শেষ হল। আর কৃত্রিম সব্‌জি চাষের পদ্ধতিকে লুফে নিল সব দেশ। বিশেষ করে মরুভূমির দেশের লোকেরা খুবই উৎসাহী হয়ে উঠল। বৃষ্টিপাত না হওয়ার জন্য মরুভূমিতে কেবল ধূ ধূ বালুরাশি। লোকজন বাস করতে পারে না সেখানে। মরুভূমির সংখ্যা এবং আয়তনও পৃথিবীতে বড় কম নয়। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, একমাত্র সাহারার আয়তনই ভারতবর্ষের দ্বিগুণ।

নানা দেশ এবার মরুভূমির বুকে সবুজের সমারোহ আনতে সচেষ্ট হল। তারপর ধীরে ধীরে মরুভূমির কিছু কিছু জায়গাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা শুরু করলেন চাষবাস। ফসও পেলেন ভালই। তাঁরা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, মরুভূমির পতিত জায়গাগুলিকে উদ্ধার করে দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে।

কৃত্রিম চাষের প্রতি বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা আবার অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। তাঁদের ধারণা, পৃথিবীর জনসংখ্যার হার যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে, তাতে ভবিষ্যতে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেই সঙ্গে তাঁরা বলতে চাইছেন, মানুষের চিরাচরিত খাদ্য তালিকার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে বিকল্প খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে। বিকল্প খাদ্যের জন্য তাঁরা কয়েকজাতের শৈবালের কথা উল্লেখ করেছেন।

এমন কতকগুলি শৈবালের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে এবং বংশ বিস্তার করতেও সক্ষম হয়। ঐ সব শৈবালের পুষ্টিগুণ নাকি অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, কোন কোন শৈবালে প্রোটিনের

পরিমাণ শতকরা সত্তর পঁচাত্তর ভাগের মত। অর্থাৎ দুধ, ডিম প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অনেক উপরে। তাছাড়া ঐ সব শৈবাল প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মানুষের দেহোপযোগী সবরকম অ্যামিনো অ্যাসিডে সমৃদ্ধ। লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ উপাদানও থাকে যথেষ্ট। এক কথায় এত খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ খাদ্য কোন দেশের কোন মানুষের খাদ্য তালিকায় নেই।

ঐ শৈবালকে চাষ করতে জমির দরকার হচ্ছে না। সেই কৃত্রিম চাষ পদ্ধতিতে ঘরের মধ্যে অথবা চৌবাচ্চা স্থাপন করে উপযুক্ত পরিমাণ শৈবাল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। জাপান প্রভৃতি দেশ সমুদ্রের তীরে অব্যবহার্য জায়গায় বড় বড় জলাধার তৈরি করে এবং জলাধারের জলে শৈবালের উপযোগী রাসায়নিক খাবার মিশ্রিত করে চাষ করছে ক্লোরেলা এবং পরফাইরা নামক দু জাতের শৈবালকে। অবশ্য ঐ শৈবালকে কাঁচা খাওয়া যায় না। তাদের খাদ্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং এই কাজটাই একটু কঠিন।

খাদ্য হিসাবে শৈবালের ব্যবহার জাপানেই সর্বাধিক। চীনও এ বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ শৈবাল সহযোগে নানা মুখরোচক খাবার তৈরি করতেও সমর্থ হয়েছে। ফলের রসের সঙ্গে শৈবালের রস মিশ্রিত করে তৈরি করছে জেলি এবং দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আইসক্রীমও তৈরি করছে।

শৈবাল উৎপাদনের খরচও যথেষ্ট কম। আর শৈবালকে উৎপাদন করতে জমি জায়গারও বড় একটা প্রয়োজন নেই। স্যাক্স যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন সেই পদ্ধতি অবলম্বন করলেই যথেষ্ট। সমুদ্রের তীরে চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী জায়গাগুলিতে বড় বড় জলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে ট্যাঙ্কের জলে রাসায়নিক খাদ্য মিশ্রিত করে জলজ শৈবাল চাষ করা যেতে পারে। আরও আশ্চর্যের কথা, কৃত্রিম উপায়ে ওদের চাষ করলে দ্রুত বাড়ে এবং অল্পদিনেই ফসল পাওয়া যায়।

কৃত্রিম উপায়ে চাষের পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে এবং পুষ্টিকর কিছু

কিছু শৈবালের সন্ধান লাভ করায় বিশেষতঃ মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। চাঁদে অথবা অন্য কোন গ্রহে, যেখানে গাছপালা নেই এবং মনুষ্য বাসোপযোগী পরিবেশ নেই, সেখানে মানুষ যদি বসতি স্থাপন করতে চায় তাহলে আগে ঐ কৃত্রিমভাবে চাষের পদ্ধতিতে শৈবাল উৎপাদন করতে হবে। পার্থিব পরিবেশের রূপদান করতে এবং বড় বড় গাছপালাকে তৈরি করতে কেটে যাবে বহুদিন। ততদিন তাদের ঐ শৈবালই মেটাবে খাদ্যের চাহিদা। অবশ্য সেখানেও জলাধার তৈরি করতে হবে এবং জলাধারের জলে প্রয়োগ করতে হবে রাসায়নিক পদার্থ। যদিও এ সব করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। গ্রহ-উপগ্রহের শিলা বিশ্লেষণের দ্বারা এবং সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে প্রয়োজনানুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও জল উভয়ই পাওয়া যেতে পারবে।

বর্তমানে সব দেশই কৃত্রিমভাবে চাষের পদ্ধতিতে আগ্রহশীল। ঐ আগ্রহটা আবার শৈবাল চাষকে কেন্দ্র করে। যদিও উক্ত ব্যাপারে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা, তবুও তাঁরা আশা করছেন অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সব কিছুরই সুরাহা হয়ে যাবে। অচিরে তাঁরা কতকগুলি বিশেষ জাতের শৈবালকে খাদ্য হিসাবে রূপান্তরের পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন এবং পুষ্টিকর টনিক ও ট্যাবলেট বাজারে ছাড়তে পারবেন। ফলে অল্প দামে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য পাবে মানুষ। আরও আশা করা যাচ্ছে, উক্ত উপায়ে পৃথিবীর খাদ্য সমস্যারও অনেকখানি সমাধান হবে।

পদার্থের অন্তিম কণা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন গ্রীকরা ছিলেন ভারি পণ্ডিত। তাঁরা বলেছিলেন, পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকলে এমন এক অবস্থায় আসবে, যখন আর তাকে কিছুতেই ভাঙ্গা যাবে না। পদার্থের সেই সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণার তাঁরা নাম রেখেছিলেন পরমাণু বা অ্যাটম। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছিলেন, যে কোন পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু সমবায়ে গঠিত।

গ্রীক দার্শনিকদের আমল থেকে আরম্ভ করে একরকম উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মানুষ সেই একই কথায় বিশ্বাসী ছিল। সব বিজ্ঞানীই মনে করতেন পদার্থের অন্তিম কণা হচ্ছে পরমাণু। পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় না, গড়াও যায় না। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ধর্মে বিভিন্ন, ইত্যাদি কত তথ্য কালে কালে বিজ্ঞানীরা পরিবেশন করেছিলেন। পরিশেষে জন ডালটন যখন পরমাণুবাদ প্রচার করলেন তখন সব দেশের বিজ্ঞানীরা ধরে নিলেন, পরমাণু সম্বন্ধে এর চেয়ে সুষ্ঠু আলোচনা দ্বিতীয় হতে পারে না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীরা হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। ক্যাথড রশ্মি এবং এক্স রশ্মির আবিষ্কার, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর সন্ধান লাভ, বিজ্ঞানীদের চিরাচরিত ধারণাকে একেবারে ওলটপালট করে দিল। স্যার জে জে. টমসন একদিন আবিষ্কার করে ফেললেন এক ধরনের মৌলিক কণিকাকে। ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী এই কণিকার নাম রাখা হল ইলেকট্রন। জগৎ তখনই বুঝতে পারল, পরমাণু অবিভাজ্য কণা নয়। তখনই দলে দলে বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন পরমাণুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে।

১৯১১ সাল। প্রখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী আরনেস্ট রাদারফোর্ড প্রকাশ করলেন পরমাণু সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলগুলি। পরমাণুর একটা মডেলও উপস্থাপিত করলেন তিনি। জগৎকে জানালেন, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস এবং তার চারপাশে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনরা।

চারদিকে সাড়া পড়ে গেল এবার। নবাবিষ্কৃত পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মনে উঁকি দিয়েছে নানা প্রশ্ন। সেইসব প্রশ্নের সমাধান করতে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একে একে জমা হতে লাগল নানা তথ্য। প্রমাণিত হল, রাদারফোর্ড আবিষ্কৃত নিউক্লিয়াসে এক ধরনের কণিকা থাকে। সেই কণিকা ধনাত্মক তড়িৎ-ধর্মী আর তার চারপাশে পরিক্রমারত ইলেকট্রনরা ঋণাত্মক তড়িৎ-ধর্মী। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান সমান সমান থাকার জন্য পরমাণুকে তড়িৎ নিরপেক্ষ মনে হয়। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে উভয় ধর্মের কণা বিদ্যমান থাকার জন্য তড়িৎসাম্য বজায় থাকে।

বিজ্ঞানীরা এইখানে থেমে গেলেন না। পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা তাঁদের রইল অব্যাহত। ইলেকট্রন ও প্রোটন কণা আবিষ্কারের পর একদিন বিজ্ঞানী পাউলি আবিষ্কার করলেন, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কেবলমাত্র ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণা প্রোটন নেই। আরও এক ধরনের কণিকা আছে। এরা তড়িৎ নিরপেক্ষ। নাম নিউট্রন। বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন ও প্রোটন স্ট্রং ফোর্স বা প্রবল বলের প্রভাবে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

স্ট্রং ফোর্স সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে আরম্ভ করে সুবৃহৎ গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই কোন না কোন বলের অধীন। মোট চার রকমের বলের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। চারটি বল যথাক্রমে মাধ্যাকর্ষণ বল, তড়িৎচৌম্বক বল, দুর্বল বল এবং প্রবল বল। গ্রহের

চারদিকে উপগ্রহরা, কিংবা নক্ষত্রের চারদিকে যে গ্রহরা পরিক্রমা করে তার মূলে আছে মাধ্যাকর্ষণ বল। ঐ বলের জন্য কোন কিছুকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করলেও সে পুনরায় ফিরে আসে।

দ্বিতীয় তড়িৎ চৌম্বক বলের প্রভাবে আলো, বেতারতরঙ্গ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৃতীয় বল অর্থাৎ দুর্বল বলের প্রভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে সমর্থ হয় এবং রশ্মি বিকিরণ করতে করতে একদিন অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রূপান্তরণের পর আর তার মধ্যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির স্ফুরণ ঘটে না। চতুর্থ বল তথা প্রবল বলের প্রভাবে নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন কণিকাগুলি দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পরমাণু শক্তির মূলে আছে ঐ প্রবল বল। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ বলই দুর্বলতম বল এবং স্ট্রং ফোর্স বা প্রবল বলই হচ্ছে প্রচণ্ডতম বল।

প্রকৃতপক্ষে এতদিনেই বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালের ধারণা পরিবর্তিত হল। প্রমাণিত হল পরমাণু নিরেট, ঠাসা, কিংবা অবিভাজ্য কণা নয়; তিন রকমের কণিকা দিয়ে পরমাণু গঠিত। একমাত্র হাইড্রোজেনের পরমাণু ছাড়া অপর যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পাওয়া যাবে তিন রকমের কণিকা তথা প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন। নিউট্রন ও প্রোটন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় বিরাজ করে এবং ইলেকট্রনরা পরিক্রমা করে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে। যেমন সূর্যের চারদিকে গ্রহরা নির্দিষ্ট কক্ষগুলিতে পরিভ্রমণ করে। অপরদিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে কেবলমাত্র একটি প্রোটন এবং তার চারপাশে পরিভ্রমণরত মাত্র একটি ইলেকট্রন।

সেই সময় বিজ্ঞানীরা পরমাণুর মধ্যে ঐ তিন কণিকার উপস্থিতি আবিষ্কার করলে পর কিছু কিছু বিজ্ঞানী কতগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করতেও এগিয়ে এলেন। সেই সব সমস্যার মধ্যে একটি ছিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য। আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন,

৯২টি মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা থেকে আরম্ভ করে মহাকাশে বিচরণরত অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত সবার মূল উপাদান ঐ ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে একটা কথা তখন তাঁরা ভেবে ঠিক করতে পারেননি, আদিতে এতগুলি মৌলিক উপাদান এসেছিল কোথা থেকে?

পরমাণুর তিন মৌলিক কণিকার সন্ধান লাভ করে বিজ্ঞানীরা বেশ খুশি হলেন। তাঁরা ধরে নিলেন, আদিতে এক অতি ঘন বিশাল আয়তনের গ্যাসীয় মেঘ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। সেই গ্যাসীয় মেঘে বর্তমান ছিল, কেবল তিন রকমের মৌলিক কণিকা—ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। উক্ত তিন কণিকা সাম্যাবস্থায় আসার জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করেছে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের। আরও ধরে নিলেন, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মূল উপাদান ঐ তিন কণিকা। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি বস্তুর মধ্যে মাত্র তিনের কল্পনা। যেন তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে মাত্র তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

বিজ্ঞানীরা পুনরায় চিন্তা করলেন, ঐ তিনটি বা এসেছিল কোথা থেকে? নিশ্চয় ঐ তিনের একটি মূল উপাদান ছিল। কিন্তু কী সেই মূল উপাদান? অনেক ভেবে ঠিক করেছিলেন, সেই ঘনীভূত গ্যাসীয় মেঘে আদিতে "ইলেম" নামে এক কণিকা ছিল। কালক্রমে সেই ইলেম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কর্ণধার এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বর, গড, আল্লা, ব্রহ্ম, যে নামেই ডাক না কেন?

বিজ্ঞানীরা পরমাণুর রহস্য পুরোপুরি ভেদ করতে পেরেছেন মনে করে যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন তা কিন্তু বেশিদিন টিকল না। মাত্র কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী ডিরাক ঘোষণা করলেন, পরমাণুর মধ্যে আরও এক ধরনের

কণিকা বিদ্যমান। এই কণিকার ভর ইলেকট্রনের অনুরূপ হলেও বৈদ্যুতিক আধান ইলেকট্রনের বিপরীত। এক কথায় উক্ত কণিকা ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট।

ডিরাক সেদিন কেবলমাত্র তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছিলেন। তাই চারদিকেই উঠল প্রতিবাদের ধ্বনি। এতকাল ধরে তাঁরা যে সব মতবাদ পোষণ করে আসছিলেন, অকস্মাৎ সেগুলি বাতিল হয়ে যায় দেখে অনেকে বিরক্তও হলেন। ভাবলেন, এ কি ছন্দ পতন!

সুরু হল পরীক্ষার পর পরীক্ষা। কিন্তু ডিরাকের সেই কণিকার কেউ সন্ধান পেলেন না। সাময়িক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ এবার মন্তব্য করলেন, তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটা ডিরাকের পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। পরমাণুতে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নেই—থাকতেও পারে না। ডিরাক একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেলেন।

উক্ত ঘটনার মাত্র দুবছর পরের কথা। ডিরাকের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে সত্যে প্রমাণিত করলেন কার্ল এনডারসন নামে একজন বিজ্ঞানী। ডিরাক যে কণিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি আবিষ্কার করলেন ঠিক সেই একই কণিকা। ইলেকট্রনের অনুরূপ কণা, অথচ ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট। উক্ত কণিকাটির তখন নাম রাখা হল পজিট্রন। অপরদিকে ইলেকট্রনের অনুরূপ অথচ ঋণাত্মক আধান যুক্ত নয় বলে পজিট্রনকে প্রতিবস্তুকণা বা অ্যান্টিপার্টিকল রূপেও গণ্য করা হল।

পজিট্রনের চরিত্র দেখে বিজ্ঞানীরা ভয়ানক আশ্চর্য বোধ করলেন। বিপরীত আধান বিশিষ্ট অথচ প্রায় সমভরের দুটি কণিকার মধ্যে পরস্পর মিলন ঘটাতে গিয়ে দেখলেন, দুটি কণাই মুহূর্তমধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কেবল বিকিরিত হল কিছুটা শক্তি।

অত্যাশ্চর্য এই ঘটনা দেখে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণভাবে সাড়া

পড়ে গেল। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পজিট্রনের মত অন্য কোন প্রতি-বস্তুকণা আছে কি না জানার জন্য গবেষণায় হলেন প্রবৃত্ত। অবশ্য ইলেকট্রনের বিপরীত কণা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ হয়েছিল, প্রোটন এবং নিউট্রনেরও বিপরীত কণা থাকতে পারে। তাই সর্বত্রই চললো প্রচণ্ড উদ্যোগ ও আয়োজন।

অচিরেই বিজ্ঞানীদের সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। একে একে আবিষ্কৃত হল প্রোটন এবং নিউট্রনের বিপরীত কণা। পূর্বের মত এদেরও অ্যান্টিপার্টিক্‌ল হিসাবে গণ্য করা হল। নাম রাখা হল যথাক্রমে অ্যান্টিপ্রোটন এবং অ্যান্টিনিউট্রন। একদিন বিশাল মহাবিশ্বের অগণিত বস্তুর মূল উপাদান খুঁজতে খুঁজতে মাত্র তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতে সেই সংখ্যা আবার বেড়ে উঠল। তিনের জায়গায় প্রমাণিত হল ছয়ের অস্তিত্ব। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, তিন বস্তুকণা আর তিন বিপরীত বস্তুকণা—মোট ছটি নিয়েই বিশ্বের বস্তুরাশি। এর উপরে নেই।

কিন্তু হায়রে হায়! বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তও অচিরে নস্যাৎ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে প্রখ্যাত জাপানী বিজ্ঞানী হিডেকি য়ুকাওয়ার কণ্ঠ হতে ভেসে এল কণা ও বিপরীত কণা ছাড়াও অন্য ধরনের কণার অস্তিত্ব আদৌ অসম্ভব নয়।

এ কি কণা! আবার চমকে উঠলেন বিজ্ঞানীরা। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে পরমাণু-জগতের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁরা এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, আর সমালোচনা করতেও প্রবৃত্ত হলেন না। য়ুকাওয়ার বিরোধিতা না করে তাঁরা লেগে গেলেন কাজে। কে উক্ত কণিকাকে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর জয়মাল্য লাভ করতে পারে?

১৯৪০ সাল। মহাজাগতিক রশ্মিসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাকালে কয়েকজন বিজ্ঞানী এরকম আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করে ফেললেন

য়ুকাওয়া বর্ণিত সেই কণিকাটিকে। তখন ঐ কণিকাটির নাম রাখা হল মেসন। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হল, মেসনরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে অথচ এরা খুবই ক্ষণস্থায়ী কণিকা। ১৯৪৮ সালে কালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানীরা সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে মেসন কণিকাকে আবার কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন করতে সমর্থ হলেন। মনুষ্য সৃষ্ট এই মেসন কণিকার বিজ্ঞানীরা নামকরণ করলেন পাই মেসন। কিছুকাল পরে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, পাই মেসনরা তিন ধরনের। ধনাত্মক আধানযুক্ত, ঋণাত্মক আধানযুক্ত এবং তড়িৎ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ সেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনের তড়িৎ-আধানের অনুরূপ।

প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনকে নিয়ে এককালে যেমন গবেষণার জন্য হিড়িক পড়ে গেছিল, এবার ঠিক সেইভাবেই গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেল মেসন কণিকাদের নিয়ে। দেখতে দেখতে তাদের অনেকগুলির ধর্মও আবিষ্কৃত হল এবং আরও দুটি মেসন কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। এই দুই মেসন কণিকার নামকরণ করা হল যথাক্রমে মিউ মেসন বা মিউওসন এবং কে মেসন বা কেওনস। আরও আশ্চর্যের কথা, মেসনেরও বিপরীত কণিকা আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ ধনাত্মক পাই মেসন যেমন লাভ করলেন, তেমনই লাভ করলেন ঋণাত্মক পাই মেসন।

পরপর ধনাত্মক ঋণাত্মক কণিকা এবং তাদের বিপরীত কণিকা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এক নতুন সত্যের সন্ধান লাভ করলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বুঝতে পারলেন, পরমাণুর অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক থেকে সর্বদাই বিরাজ করছে এক সাম্যাবস্থা। প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন, নিউট্রন-অ্যান্টিনিউট্রন, ইলেকট্রন-পজিট্রন, ধনাত্মক পাই-মেসন—ঋণাত্মক পাই-মেসন, কণা আর বিপরীত কণা। সদা সাম্যরূপ। কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা। সেই নিয়ম তথা সদা সাম্যাবস্থা বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও। উপগ্রহ

ঘুরছে সূর্যের চতুর্দিকে, গ্রহ ঘুরছে নক্ষত্রের চতুর্দিকে, নক্ষত্র পরিক্রমা করছে বিশাল নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সির চতুর্দিকে। আর নক্ষত্রজগৎও স্থির হয়ে নেই। তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে। সর্বত্র সাম্যরূপ। বাহির থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই।

বিজ্ঞানীরা এখানেও থামলেন না। পরমাণুর মধ্যে উপরোক্তগুলি ব্যতীত অন্য কোন কণিকা আছে কি না সে বিষয়ে পুনরায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল আরও বহু কণিকা। শেষে দেখা গেল তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এবং আবিষ্কৃত কণিকা সব মিলিয়ে ওদের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় একশ' এর কাছাকাছি। বিজ্ঞানীরা এবার সত্য সত্যই মহা ভাবনায় পড়লেন। এতগুলি কণিকার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা বা জ্ঞানলাভের উপায় কি? এককালে মৌলিক পদার্থগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ঠিক সেই সেই সমস্যার মুখোমুখি হলেন তাঁরা। আরও একটি সমস্যার উদ্ভব হল। একদিন যে প্রোটন এবং নিউট্রনকে তাঁরা মৌলিক কণিকারূপে চিহ্নিত করেছিলেন, এখন দেখলেন ওরা আদৌ মৌলিক নয়। তাহলে কোন্ কোন্ কণিকা সমন্বয়ে গঠিত প্রোটন ও নিউট্রনরা? আবার যে কণিকা দিয়ে ওরা গঠিত সেই কণিকারা মৌলিক কিনা, সে কথা কে বলতে পারে? না কি মূল কণিকা বলতে কিছু নেই? এইভাবে যদি চলতে থাকে অর্থাৎ একশ' কণিকার প্রত্যেকের উপাদান, সেই উপাদানের আবার উপাদান, এমনই যদি আবিষ্কার হতে থাকে তাহলে কোন্ সমস্যার সমাধান করবেন তাঁরা?

শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হল। বুঝতে পারলেন, ইলেকট্রনরাই হচ্ছে মৌলিক কণিকা এবং প্রোটন এবং নিউট্রনরা মূলতঃ তিনটি কণিকা সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ প্রোটন কিংবা নিউট্রনের মৌলিক উপাদান তিনটি। ওদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য অবশ্য তাঁরা আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন না।

উপরোক্ত তথ্যগুলি আবিষ্কারের পর কণিকাগুলি সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা ওদের প্রধান দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একশ্রেণীর কণিকাদের নাম "লেপটনস" এবং অপর শ্রেণীর নাম "হ্যাড্রনস"। লেপটন ও হ্যাড্রন দুটিই গ্রীক শব্দ। লেপটন অর্থে হালকা এবং হ্যাড্রন অর্থে ভারী বুঝায়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রচেস্টারে অনুষ্ঠিত পদার্থ বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনীতে প্রখ্যাত রুশ পদার্থবিদ্ এল. বি. ওকুন হ্যাড্রন শব্দটির প্রচলন করেন। গ্রীক আড্রস শব্দটি থেকে তিনি হ্যাড্রন কথাটি গ্রহণ করেন। পরে ওরই বিপরীত শব্দ হিসাবে লেপটন গৃহীত হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মতে লেপটন শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত কণিকাই মৌলিক কণিকা। এই শ্রেণীতে পড়ে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো, মিউওন প্রভৃতি কণিকা। ওদের মৌলিক কণিকারূপে চিহ্নিত করার কারণ, উক্ত কণিকাদের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করলে একেবারে ভাঙ্গে না। স্ট্রং ফোর্স বা প্রবল বলের কাছে ওরা নিষ্ক্রিয়। তাই লেপটনদের মধ্যে অন্য কোন কণিকা নেই বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কণারা অর্থাৎ হ্যাড্রনরা মৌলিক কণিকা নয়। প্রোটন, নিউট্রন, অ্যান্টিপ্রোটন প্রভৃতি বহু কণিকা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হ্যাড্রনরা লেপটন অপেক্ষা অনেক বড় ও ভারী। তবে প্রোটন এবং অ্যান্টিপ্রোটন ছাড়া এই শ্রেণীর সমস্ত কণিকাই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্ত মধ্যেই তারা কিছুটা শক্তির সৃষ্টি করে ফোটন, নিউট্রিনো প্রভৃতি কণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা হ্যাড্রনদের আবার তিনটি পরিবারে বিভক্ত করেছেন। পরিবারগুলি যথাক্রমে বেরিওনস, অ্যান্টিবেরিওনস এবং মেসনস। প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণারা বেরিওনস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টিনিউট্রন প্রভৃতিরা অ্যান্টিবেরিওনস পরিবারের এবং পাই-মেসন প্রভৃতি কণারা মেসন পরিবারের কণিকা।

উপরোক্ত পরিবারগুলির প্রত্যেকের সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানীরা হ্যাড্রন কণাদের আরও কয়েকটি ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত করেছেন। ঐ পরিবারের সদস্য সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। কোন পরিবারে আছে মাত্র একটি, কোনটিতে দুই, আবার কোন কোনটিতে তিন অথবা চার। ঐ পরিবারগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পরিবারের কণারা ধর্মের দিক থেকে প্রায় এক এবং ভরও সমান। যে সব কণার ভর ও ধর্ম স্বতন্ত্র তাদের মাত্র একটিকেই একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পরিবারগুলিকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় মালটিপ্লেটস বলা হয়।

পরবর্তীকালে মালটিপ্লেটসগুলিকে নিয়ে পুনরায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হন অনেক বিজ্ঞানী। বেশ কিছু ত্রুটিও ধরা পড়ে। তখন ১৯৬২ সালে গেলমান প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানী মালটিপ্লেটসগুলিকে নতুন করে বিন্যাস করেন। তাঁদের বিন্যাস বিজ্ঞানীরা সানন্দে গ্রহণও করেন এবং নাম হয় সুপার মালটিপ্লেটস।

গেলমান প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সেদিন হ্যাড্রন কণাদের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন সেই পদ্ধতিটির নাম "এইট ফোল্ড ওয়ে" বা অষ্টাঙ্গিক পথ। হ্যাড্রন কণিকাদের মডেলও উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে হ্যাড্রনরা তিনটি মৌলিক কণিকা দিয়ে গঠিত। ঐ মৌলিক কণিকাদের নামকরণ করেছেন "কোয়ার্ক"। যে মডেলটি তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন তাকে বলা হয়েছে কোয়ার্ক মডেল। এককালে পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাদারফোর্ড, নীলস বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা যেমন মডেল তৈরি করেছিলেন, এও অনেকটা সেই রকমই।

হ্যাড্রনদের মূল তিনটি কণিকা বা কোয়ার্ক এবং তার বিপরীত কণিকা অ্যান্টিকোয়ার্কের কথাও উল্লেখ করেছেন গেলমান। বেরিওনস, অ্যান্টিবেরিওনস ও মেসনস—এই তিন পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে

তিনি উল্লেখ করেছেন, বেরিওনরা তিনটি কোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত। অপরপক্ষে অ্যান্টিবেরিওনদের উপাদান তিনটি অ্যান্টিকোয়ার্ক কণা। কিন্তু মেসন কণাদের উপাদান তিনটি নয়। মেসনরা মাত্র একটি কোয়ার্ক কণা এবং একটি অ্যান্টিকোয়ার্ক কণা সমবায়ে গঠিত।

একদিন পরমাণুকেই ধরা হত বস্তুর অন্তিম কণা। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে উক্ত মত পরিত্যক্ত হল। ধরা হল, পরমাণুর আবার অন্তিম কণা আছে। তারা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। এই মতও বেশিদিন টিকল না। আবিষ্কৃত হল কাছাকাছি একশ'র মত কণিকা। হয়ত সেদিন ভেবেছিলেন বিজ্ঞানীরা, এরা সবাই মৌলিক। কিন্তু অচিরে প্রমাণিত হল, এদের অধিকাংশই মৌলিক নয়। মৌলিক উপাদান ঐ কোয়ার্ক কণা। এদের চরিত্রও বড় অদ্ভুত এবং বিচিত্র। সব তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তাহলেও পুনরায় সেই তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে যাচ্ছে হ্যাড্রন কণিকারা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে আসে। একদিন পরমাণুর যখন রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় নি, সেদিন বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থের নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। কোন কোন মৌলিক পদার্থের চরিত্র তথা ধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে রসায়নবিজ্ঞানী ওদের শ্রেণীবিন্যাস করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শেষে প্রখ্যাত রুশবিজ্ঞানী মেণ্ডালিয়ভই পর্যায় সারণী তৈরি করে গবেষণার এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি একদিকে যেমন আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির স্থান সারণীতে যথাযথভাবে নির্দেশ করেছিলেন তেমনই অনাবিষ্কৃত মৌলদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। পরবর্তীকালে সার্থক হয়েছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। পর্যায় সারণীকে ভিত্তি করে বহু বিজ্ঞানী নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে বরণীয় হয়েছেন। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়েও তৈরি হয়েছে বহু মৌলিক পদার্থ।

বর্তমানে আবিষ্কৃত পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকাদেরও শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। মেণ্ডালিয়ভের মত শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়েই বহু

কণিকার সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাই এত অধিক সংখ্যক কণিকা বিজ্ঞানীদের বর্তমানে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। হয়ত ভবিষ্যতেই এগুলি তাঁদের হস্তগত হবে। তারপর সেদিন পরমাণু বিজ্ঞান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলা বড় কঠিন। তোমাদের কালে তোমরাই অনেক বেশি বলতে পারবে।

অতিপরিবাহিতা

তোমাদের প্রথমে ছোট্ট একটি পরীক্ষার কথা বলি।

একখানা কাচদণ্ডকে রেশমী কাপড় দিয়ে বেশ ভালভাবে রগড়াও। তারপর ঐ কাচদণ্ডকে খুব ছোট ছোট কয়েক টুকরা কাগজের সামনে ধর। দেখবে, কাগজের টুকরোগুলো তড়বড় করে নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে একেবারে লেপটে যাবে কাচদণ্ডের গায়ে।

উক্ত পরীক্ষায় যদি কাচদণ্ডের পরিবর্তে একটা পেতলের দণ্ড গ্রহণ কর, তাহলে কিন্তু অনুরূপ ঘটনা ঘটবে না। অর্থাৎ কাগজের টুকরোগুলো পেতলের দণ্ড কর্তৃক আকৃষ্ট হবে না।

কেন এমন হয় না?

এখানে ঘর্ষণের ফলে তড়িতের উৎপত্তি হচ্ছে। কাচের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না বলে উৎপন্ন তড়িৎ কাচদণ্ডের গায়ে জমা থাকে। কিন্তু পেতলের ভেতর দিয়ে তড়িৎ খুব ভালভাবে যাতায়াত করতে পারে বলে ঘর্ষণের ফলে যে পরিমাণ তড়িৎ উৎপন্ন হয় তার সবটুকুই পেতলের দণ্ড বেয়ে, আমাদের হাতের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করছে এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীর হয়ে প্রবেশ করছে মাটিতে। এখানে উৎপন্ন তড়িতের পরিমাণ এত কম যে, এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা কিছুতেই টের পাচ্ছি না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সব পদার্থের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত

হতে পারে না। যে সব পদার্থের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রাহ সহজে চলাচল করতে পারে তাদের বলা হয় পরিবাহী এবং যাদের ভেতর দিয়ে সহজে চলাচল করতে পারে না তাদের বলা হয় অপরিবাহী। যে কোন ধাতু, মাটি, জীবদেহ, গ্রাফাইট প্রভৃতি পরিবাহীর উদাহরণ। কিন্তু কাঠ, কাচ, মোম প্রভৃতি অপরিবাহী। তবে একথাও সত্য যে, কোন পদার্থ সম্পূর্ণরূপে অপরিবাহী নয়। খুব অল্প হলেও তাদের ভেতর দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে। কিন্তু অপরিবাহী পদার্থগুলোর ভেতর দিয়ে এত কম তড়িৎ প্রবাহিত হয় যে তাকে সব সময় অগ্রাহ্যই করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, যখন কোন তড়িৎপ্রবাহ পরিবাহীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন পরিবাহী নিজেই প্রবাহের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা একটা সহজ উদাহরণের সাহায্যে বাখ্যা করা যেতে পারে।

যেমন ধর, একটা পাইপের ভেতর দিয়ে প্রবল বেগে জল যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, পাইপের দুপ্রান্তে চাপের তারতম্য না থাকলে জল কিছুতেই প্রবাহিত হতে পারত না। এ ক্ষেত্রে এক প্রান্তে উচ্চচাপ থাকার জন্য অন্য প্রান্তে অর্থাৎ নিম্ন চাপযুক্ত স্থানের দিকে জলপ্রবাহ হয়। চাপের পার্থক্য এবং দৈর্ঘ্য ঠিক রেখে যদি মোটা পাইপ ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রবাহের মাত্রা বাড়বে। অপরপক্ষে চাপের পার্থক্য থাকলেও পাইপের দৈর্ঘ্য বাড়লে প্রবাহের মাত্রা কমবে। আবার যত সরু পাইপ ব্যবহার করা হবে ততই প্রবাহের পরিমাণ কমবে। অতএব জলপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করছে বাধার উপর। ছোট ও মোটা পাইপে জল কম বাধা পায় এবং লম্বা ও সরু পাইপে বাধা পায় বেশি।

তড়িৎপ্রবাহের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যে ধাতব তার কিংবা পাত দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় সেই তার কিংবা পাতের প্রস্থচ্ছেদ এবং দৈর্ঘ্যের উপর তড়িৎপ্রবাহ নির্ভর করে। মোটা তার হলে

অর্থাৎ তারের প্রস্থচ্ছেদ বেশি হলে জলপ্রবাহের মত তড়িৎপ্রবাহও বাধা পায় কম। কিন্তু যে তারের প্রস্থচ্ছেদ কম, অর্থাৎ সরু তারের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ গেলে বেশি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে একথাও সত্য যে, মোটা কিংবা সরু যে কোন ধরনের তার ব্যবহার করা হোক না কেন কিছু বাধা প্রদান করবেই করবে। এই বাধাকে বলা হয় রেজিস্ট্যান্স বা রোধ।

বিজ্ঞানীরা রোধ সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাকে দীর্ঘকাল মনে মনে পোষণ করে আসছিলেন। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণও করেছিলেন। সেই কারণে রোধ সম্বন্ধে ধারণার মূলে কারও কোন সন্দেহও ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে গবেষণা কালে একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করলেন কামেরলিং ওন্‌নেস নামে হল্যাণ্ডের এক নামকরা বিজ্ঞানী।

উত্তম পরিবাহীর অনুসন্ধান করাই ছিল ওন্‌নেসের কাজ। এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা রকমের পদার্থকে নিয়ে পরীক্ষা করতেন এবং উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা পরিবর্তন হয় কিনা তাও দেখতেন। একদিন পারদকে নিয়ে পরীক্ষাকালে তিনি অবাক হলেন। দেখলেন, সাধারণভাবে পারদের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে পারদ বাধা প্রদান করে। পারদ অবশ্য উত্তম তড়িৎ পরিবাহী। অথচ সেই পারদের তাপমাত্রাকে কমাতে কমাতে ৪·২ ডিগ্রি কেলভিনের নিচে নামিয়ে আনলে সে তড়িৎপ্রবাহে আর কিছু মাত্র বাধা সৃষ্টি করছে না। অথবা যতটুকু রোধ বা বাধা সৃষ্টি করছে, তার পরিমাণ এমন নগণ্য যে তাকে সহজেই উপেক্ষা করা চলতে পারে।

উক্ত ঘটনা লক্ষ্য করে আশ্চর্য বড় কম হলেন না ওন্‌নেস। বেশ কয়েকবার পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করলেন একই ব্যাপার। অথচ কারণ তিনি ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। তখন তাঁর পরীক্ষার কথা জানালেন অন্যান্য পদার্থ বিজ্ঞানীদের।

যাঁরা শুনলেন, তাঁরাই হাতে নাতে করে দেখলেন পরীক্ষাটিকে। ওন্‌নেসের মত বিস্মিত হলেন সবাই। ব্যাখ্যা অবশ্য কেউ করতে পারলেন না। তবে ৪.২ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় পারদ পরিবাহীর উক্ত গুণের জন্য বিজ্ঞানীরা নাম রাখলেন অতিপরিবাহিতা বা সুপার কনডাকটিভিটি। অনেক বিজ্ঞানী আবার পারদ ব্যতীত অন্য কোন পরিবাহী নিম্ন তাপমাত্রায় উক্ত গুণ প্রাপ্ত হয় কিনা সে বিষয়েও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। আবিষ্কারও করলেন দু একটি ধাতু। কিন্তু পরিবাহীর কোন্ গুণের জন্য যে এই অসম্ভব সম্ভব হয়ে থাকে, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

ওন্‌নেস অনেক আগেই হিলিয়াম নামক গ্যাসটির তরলীকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এবার পারদের অতিপরিবাহিতা গুণ আবিষ্কার করে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হলেন। নোবেল পুরস্কার কমিটিও ১৯১৩ সালে তাঁকে সম্মানিত করল নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। কারণ ব্যাখ্যা করতে তিনি সমর্থ হননি। বা অতিপরিবাহিতার গুরুত্বও সেদিন বড় একটা কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তথাপি পদার্থের অতিপরিবাহিতাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার সূচনা করেছিলেন। উক্ত শাখাটির নাম ক্রাইওজেনিকস।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের অতিপরিবাহিতা গুণ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এর উপযোগীতা বিশেষ উপলব্ধি করতে পারেন নি কেউ। অর্থাৎ এর যে একটা ভাল ব্যবহারিক দিক আছে, সে চিন্তা তখন কারও মাথায় আসে নি। তাই দীর্ঘকাল ধরেই উক্ত আবিষ্কারটি একরকম অবহেলিত অবস্থায় ছিল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল কেউ আগ্রহও প্রকাশ করেনি বড় একটা।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে বিদ্যুৎকে সর্বত্র নিয়োগের প্রচেষ্টা।

উদ্ভূত হয়েছে কত হরেক রকমের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভূত হল সর্বক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়াতে গেলে বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টেজ বাড়াতে হচ্ছে। অথচ পরিবাহীর ঐ রোধটাই করছে যত অসুবিধা। রোধ থাকার জন্যই ভোল্টেজের পরিমাণ যথাযথভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়ে উঠছেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তখনই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, যদি এমন কোন পরিবাহীর সন্ধান পাওয়া যায়—যা তড়িৎ চলাচলের কাজে আদৌ বাধা দান করে না তাহলেই উল্লেখযোগ্যভাবে ভোল্টেজ বাড়ানো সম্ভব হবে। অপরদিকে পরিবাহীর যদি কোন রোধ না থাকে তাহলে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে সেটি উত্তপ্তও হবেনা। ফলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে।

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। বলাবাহুল্য, আগেই বিজ্ঞানীদের মনে এল ওন্‌নেসর পরীক্ষার কথা। পারদের অতিপরিবাহিতা গুণকে প্রথমে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন। ভাল ফলও এল অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কিন্তু দেখা গেল, একমাত্র পারদের দ্বারা সব অভাব দূর হবে না। তখনই বিজ্ঞানীরা নিমজ্জিত হলেন পারদ ব্যতীত অন্যান্য পদার্থকে আবিষ্কার করতে—যারা নিম্ন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহিতার গুণ প্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞানীদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। আবিষ্কার করলেন বেশ কয়েকটি ধাতু, যারা নিম্ন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহীর আচরণ করে। এক কথায় ওরা রোধ সৃষ্টি করে না অতি অল্প করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন না—কেন ঐ ধাতুগুলি নিম্ন তাপমাত্রায় এমন অদ্ভুত আচরণ করে?

বিজ্ঞানের রাজ্যে এমনটি হওয়া তো উচিত নয়! যথাযথ কারণ নির্ণয় করতে না পারলে বিজ্ঞান কেন? অতএব বিজ্ঞানীরা অতি-পরিবাহী পদার্থের সন্ধান আপাততঃ স্থগিত রেখে কেন বস্তু অতি পরিবাহিতার গুণ প্রাপ্ত হয়, সেই তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকেই অধিকতর

আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

অবশেষে বহু গবেষণার পর বার্ডিন ও ফ্রোহলিশ নামে দুজন বিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে এবং একই তথ্য পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপিত করলেন। তাঁরা জানালেন, ধাতব কেলাসের মধ্যে এক ধরনের ভাইব্রেশন্যাল এনার্জি বা কম্পনশক্তি কাজ করে। তাঁদের মতবাদটি অনেকাংশে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরি বা কণাতত্ত্ব তত্ত্বের অনুরূপ। প্ল্যাঙ্কের মতে যখন কোন উৎস থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হয়, তখন তা অসংখ্য কোয়ান্টা বা ফোটনের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এইভাবে বার্ডিন ও ফ্রোহলিশ ধরে নিয়েছিলেন, নিম্নতাপমাত্রায় ধাতব কেলাসগুলি পরস্পর সংবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং তড়িৎপ্রবাহের ফলে যে কম্পন জাগে তাতে এক একটি শক্তি কণিকা বা "ফোনন" নির্গত হয়।

বার্ডিন ও ফ্রোহলিশের মতবাদ বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখলেন, তত্ত্বটি সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হচ্ছে না। তখন অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য কোন তত্ত্বের অবতারণা করা যায় কিনা—সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। এমন কি বার্ডিন নিজেও বাদ পড়লেন না। কয়েকজন সহযোগিকে নিয়ে পুনরায় আরম্ভ করলেন গবেষণা।

১৯৫৬ সাল। বার্ডিন এবং তাঁর দুই সহযোগী কুপার এবং শ্রিফার অতিপরিবাহিতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি তত্ত্ব দাঁড় করালেন। ঐ তত্ত্বে তাঁরা জানালেন, পরিবাহীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন জোড় সৃষ্টি হলেই পরিবাহী অতিপরিবাহী রূপে কাজ করে। এবং একমাত্র নিম্ন তাপমাত্রায়ই এটি সম্ভব হয়ে থাকে।

অনেক পূর্বে অবশ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ মানেই ইলেকট্রনের প্রবাহ। তারপর বার্ডিন ও ফ্রোহলিশের মতবাদ থেকে আরও জানতে পেরেছিলেন, ধাতব পরিবাহী মাত্রই কেলাসের সমন্বয় এবং ধাতব পরমাণুর ইলেকট্রনরাই কেলাসগুলিকে

পরস্পর সুসংবদ্ধ অবস্থায় রাখে। বার্ডিন, কুপার এবং শ্রিফার প্রমাণ করলেন, নিম্ন তাপমাত্রায় ইলেকট্রন জোড়গুলি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গতিশীল হয়। অনেকে উক্ত তত্ত্বকে লেসার রশ্মির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখন ঐ লেসার রশ্মি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

লেসারের পুরো নাম হচ্ছে Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. ইংরাজী শব্দগুলির আদ্য-অক্ষরকে নিয়ে গঠিত শব্দ LASER বা লেসার। অর্থাৎ এত বড় বড় শব্দগুলিকে সব সময় উচ্চারণ করার অসুবিধার জন্য সংক্ষেপিত নাম।

লেসার রশ্মি বর্তমান শতাব্দীর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। কিন্তু উক্ত রশ্মি উৎপাদনের মূলে আছে কোয়াণ্টা বা ফোটনবাদ। সাধারণ আলোকরশ্মি অর্থাৎ সাদা আলো বলতে আমরা জেনেছি, নানা বর্ণের এবং নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের কোন কোনটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কোনটি হয় না, আবার কোন কোনটি কেবলমাত্র অনুভূতি জাগাতে সমর্থ হয়। ওদের পৃথকও করা যায় না।

বিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানীরা রুবি, ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোককে বিচ্ছিন্ন করে লেসার হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ রশ্মির মধ্যে অন্য কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকের মিশ্রণ থাকে না। একেবারেই শুদ্ধ রশ্মি এবং তীব্রতাও সাধারণ আলোকরশ্মির অপেক্ষা অনেক বেশি। উক্ত রশ্মি উৎপাদনের মূলে আছে ফোটনবাদ। কোন পদার্থের উপর একটি ফোটনকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেরণ করলে সেই ফোটন পদার্থের পরমাণুদের উত্তেজিত করে এবং আরও কিছু সংখ্যক ফোটন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তখন পরমাণুর মধ্যেও চলে শৃঙ্খল প্রক্রিয়া। তারপর ফোটনরা সুসঙ্গতভাবে এবং সমান্তরালে

এগিয়ে যায়। তখন এই রশ্মিকে লেসার বলা হয়।

তেমনই বার্ডিন, কুপার এবং শ্রিফারের তত্ত্ব অনুযায়ী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে পরিবাহীকে বিশেষ একটি নিম্ন তাপমাত্রায় আনলে যখন সে অতিপরিবাহিতার গুণ প্রাপ্ত হয় তখন তার ইলেকট্রন জোড়গুলি লেসারের মত সুসংহত ও সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় ধাতব কেলাসের কম্পনশক্তি তাকে আর বাধা প্রদান করতে পারে না বা এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না। ফলে বিদ্যুৎ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে কেবল এগিয়েই যায়। অর্থাৎ এই অবস্থায় পরিবাহী কোনপ্রকারে রোধ সৃষ্টি করতে পারে না।

বার্ফিন, কুপার ও শ্রিফারের তত্ত্বটিকে বিজ্ঞান স্বীকৃতি দান করেছে। উক্ত তত্ত্বটির নামকরণ করা হয়েছে বি. সি. এস. তত্ত্ব। বলাবাহুল্য আবিষ্কারকদের নামের প্রথম অক্ষরগুলিকে গ্রহণ করেই উক্ত নামকরণ। বার্ডিনের বি, কুপারের সি, এবং শ্রিফারের এস। সংক্ষেপে বি. সি. এস।

বিদ্যুতের মত তাপের ক্ষেত্রেও অতিপরিবাহিতার ঘটনা ঘটে থাকে। এবং এখানেও সেই নিম্নতাপমাত্রার ব্যাপার। কোন বস্তুকে নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করাতে করাতে অত্যধিক নিম্ন তাপমাত্রায় যখন আনা যায়, তখন তার মধ্যে অদ্ভুত সব গুণ প্রকাশ পায়। যেমন হিলিয়াম নামক গ্যাসটিকে ঠাণ্ডা করে তরলে পরিণত করার পরও যদি ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমানো যায় তাহলে—২৮০° ডিগ্রি তাপমাত্রায় সব রকমের বাধাকে সে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। এমন কি যে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কোন তরল আসা যাওয়া করতে পারে না. সেই ছিদ্র দিয়ে অতি শীতল হিলিয়াম অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে।

অনেকের বিশ্বাস, মানবদেহও যদি ধীরে ধীরে নিম্ন থেকে নিম্নতর তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলেও অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করতে সেও সমর্থ হবে। সক্রেটিস খালি গায়ে

এবং খালি পায়ে বরফের উপর চলাফেরা করতে পারতেন—কথাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ভারতের যোগী-ঋষিরা হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে শৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন থাকতেন বা এখনও আছেন। অদ্ভুত সমস্ত ক্ষমতার বলে বলবান তাঁরা। যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যোগবলে শরীরকে নিম্নতাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করিয়ে কী তাঁরা অসাধ্য সাধন করে থাকেন এবং সৎ-চিৎ আনন্দময় সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন ?

ভারী জল

তোমরা অনেকে হয়ত বলবে, জলের আবার ভারী হালকা কী ? জল তো অতি সাধারণ পদার্থ ! আমরা কথায় কথায় সহজ জিনিসকে বুঝাতে গিয়ে উদাহরণ দিয়ে থাকি "জলের মত সোজা"। তাহলে ?

অনেকে আবার হয়ত একটু চিন্তা করে বলবে, বোধহয় ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের কণা বলা হচ্ছে। কেননা অপরাপর যে কোন তাপমাত্রার জল অপেক্ষা ঐ তাপমাত্রায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক। একটা উদাহরণও হয়ত দিয়ে বসবে। বলবে, ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জল ভারী হওয়ার জন্য শীতপ্রধান দেশসমূহের হ্রদ কিংবা সাগর তলার জল পরিচলন প্রক্রিয়ায় উপরে উঠে বরফ হতে পারে না বলে তলায় জলই থেকে যায় এবং উক্ত কারণে জলচর প্রাণীরা বেঁচে থাকে।

কিন্তু এখানে ভারী জল অর্থে ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার জলকে বলা হচ্ছে না। তাহলে ভারী জল কী ?

এবার হয়ত কেউ কেউ চিন্তা করে বলবে, হ্যাঁ ঠিক বটে ! আরও এক ধরনের ভারী জলের কথা মনে পড়ছে। ভারী হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যে জল গঠন করে তারই নাম ভারী জল।

H_2O-র পরিবর্তে D_2O—এই সঙ্কেতের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করে থাকেন।

D_2O অবশ্যই ভারী জল। সাধারণ জলের আণবিক ওজন ১৮ কিন্তু D_2O-র আণবিক ওজন ১৯। এখানকার আলোচ্য বিষয় যদিও এক বিশেষ ধরনের জল, তবুও D_2O-এর প্রসঙ্গ এসে যায়। তাই D_2O সম্বন্ধে আগেই একটু আগেই আলোচনা করা হল।

একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারী হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন ক্রিয়া করে যে জল গঠন করে তাকেই রসায়ন বিজ্ঞানের পরিভাষায় "হেভি ওয়াটার" বা ভারী জল বলে।

উত্তরটা ঠিক হল বটে, কিন্তু গোলমাল থেকে গেল। ভারী হাইড্রোজেন আবার কেমন জিনিস?

ভারী হাইড্রোজেন বা হেভি হাইড্রোজেন বলতে ডয়েটেরিয়াম, ট্রাইট্রিয়াম ইত্যাদিকে বুঝায়। সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে মাত্র একটি প্রোটন থাকে এবং একটি ইলেকট্রন থাকে পরিক্রমারত অবস্থায়। ইলেকট্রনের ওজন নগণ্য বলে এবং একটি মাত্র প্রোটন থাকার জন্য সাধারণ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন মাত্র এক। ওর নিউক্লিয়াসে কোন নিউট্রট নেই।

আরও একটি কথা, হাইড্রোজেনের ধর্মও প্রোটনের উপর নির্ভরশীল। যদি তার নিউক্লিয়াসে একটি কিংবা দুটি নিস্তড়িৎ নিউট্রন কণা স্থান পায় তাহলে মূল ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। কেবল পারমাণবিক ওজনটাই বৃদ্ধি পায়। কেননা, নিউট্রনের ওজন প্রোটনের প্রায় সমান। তাই যে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে তার ওজন হয় দুই—সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ এবং ঐ হাইড্রোজেনের নাম ডয়েটেরিয়াম। নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন থাকলে পারমাণবিক ওজন হবে তিন। সাধারণ হাইড্রোজেনের তিন গুণ ভারী। তখন নাম তার ট্রাইট্রিয়াম। অতএব ভারী হাইড্রোজেন ওদের অবশ্যই বলা যায়।

আরও জানা গেছে, সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে ভারী হাইড্রোজেন খুব কম পরিমাণে মিশে থাকে। এত কম যে, এর উপস্থিতি সহজে নির্ণয় করা যায় না। তথাপি ভারী হাইড্রোজেন তথা ডয়েটেরিয়াম যুক্ত জলের অণু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। সাধারণ হাইড্রোজেনের পরিবর্তে ডয়েটেরিয়াম থাকে বলে উক্ত জলের আণবিক ওজন ১৯। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, জলের সাড়ে চার হাজার অণুর মধ্যে মাত্র একটিতে ভারী হাইড্রোজেনের অণু থাকে। সমুদ্র জলে ভারী জলের অণু পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। একমাত্র মেরু সাগরের জলেই কিছু বেশি পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্যের কথা, যে কোন প্রাকৃতিক জলে, ডাবের জলে, এমনকি কোন কোন ফলের রসেও ভারী জলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও পরিমাণটা নিতান্তই কম।

ভারী জলের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ কিন্তু ভারী জলের ১·১০৭৬৪। ওর হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে ৩·৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ১০১·৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তড়িৎবিশ্লেষণের ফলে সাধারণ জল অতি সহজে বিয়োজিত হয় কিন্তু ভারী জল হয় না। উক্ত কারণে যে জলে ভারী জলের অণু থাকে সেই জলকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে সাধারণ জলের সবটুকুই বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষরূপে পড়ে থাকে ভারী জলের অণু। ঐ একটি কারণে সাধারণ জল থেকে ভারী জল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা আজকাল এই উপায়ে ভারী জলকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং ঐ ভারী জল থেকে সংগ্রহ করেছেন ভারী হাইড্রোজেন। আর ঐ ভারী হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাই পারমাণবিক জ্বালানীর সুবিধা হয়েছে অনেকখানি।

ভারী জল বর্তমান শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়েছিল ওর গুরুত্ব। তাই ঐ ভারী জলের আবিষ্কর্তা

প্রসিদ্ধ মার্কিন রসায়নবিজ্ঞানী হ্যারল্ড সি. উরেকে ১৯৩৪ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছিল।

D_2O বা হেভি ওয়াটার সাধারণ জল অপেক্ষা ভারী সত্য কিন্তু এর চেয়েও ভারী আর এক রকম জলের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও সেই জল সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে তবুও ওর অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারছেন না তাঁরা। সাধারণ জল এবং হেভি ওয়াটারের চেয়ে অনেক ভারী এই জল। উক্ত জলের অবস্থিতি প্রথম ঘোষণা করেন ফেডিয়াকিন নামে জনৈক সোভিয়েত বিজ্ঞানী।

১৯৬১ সাল। বিজ্ঞানী নিকোলাই ফেডিয়াকিন জলের পাতন প্রণালী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন একরকম আকস্মিকভাবেই সন্ধান লাভ করলেন উক্ত জলের। তিনি কাচের যে পাতন যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন, তাতে দেখলেন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা যন্ত্রের দেওয়ালে জমাট বেঁধে আছে।

ফেডিয়াকিন জমাট বাঁধা সেই জলকণাগুলোকে উপেক্ষা করলেন না। খুব সাবধানে তাদের সংগ্রহ করলেন এবং এর প্রকৃত পরিচয় লাভ করার জন্য যত্নবান হলেন। অচিরে বুঝতে পারলেন, এই জল সাধারণ জলও নয় বা D_2O-ও নয়। সাধারণ জলের গুণই বর্তমান। তবে অত্যন্ত ভারী। এমনকি D_2O থেকেও। তখন ফেডিয়াকিন ভাবলেন, অসাবধানতাবশতঃ হয়ত বা কোন পদার্থ উক্ত জলে দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ায় এত ভারী হয়েছে। তথাপি বিশেষ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জলটিকে ফেলে দিলেন না। আরও পরীক্ষা চালালেন। অবশেষে ওর চরিত্র দেখে এমন বিস্মিত হলেন, যে, কিছুতেই আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

এখন প্রশ্ন এল মনে, জটিল কোথা থেকে এল ? একবার, দুবার, এইভাবে বেশ কয়েকবারই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। আর আশ্চর্যের কথা, প্রতিবারেই কাচযন্ত্রের গায়ে লাভ করলেন জমাট বাঁধা

উক্ত জলকণা। কাচ পাত্রের বদলে কোয়ার্টজ-এর তৈরি পাত্র ব্যবহার করেও একই ফল লাভ করলেন।

ফেডিয়াকিন এবার নিঃসন্দেহ হয়ে ওর গুণাগুণ ভালভাবে পরীক্ষা করার জন্য হলেন যত্নবান। দিনের পর দিন ধরে চলল তাঁর পরীক্ষা। শেষে বুঝতে পারলেন, এই জলের চরিত্র অত্যন্ত বিস্ময়কর। ঠাণ্ডা করতে করতে—১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে আনলেও কিছুতেই জমে বরফে পরিণত হচ্ছে না। তবে ০° ডিগ্রির নিচে ১০০° ডিগ্রিতে শীতল করলে তারল্যভাবে হারিয়ে ফেলে বেশ চকচকে হয়ে উঠছে। অথচ সাধারণ জল মাত্র ০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এসে গেলেই জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়ে যায়।

এবার ঐ জলের স্ফুটনাঙ্ক সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন ফেডিয়াকিন। এক্ষেত্রেও বিস্মিত বড় কম হলেন না। সাধারণ জল মাত্র ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বাষ্পীভূত হয়ে যায়, D_2C-র ক্ষেত্রে একটু বেশি। কিন্তু এই ভারী জল ৭০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়ও অবিকৃত থাকছে। আরও আশ্চর্য হলেন, ৭০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নিয়ে গেলে জলটা সে আর জল থাকছে না। বিশ্লিষ্ট হয়ে একেবারে সাধারণ জলে পরিণত হয়ে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে।

ফেডিয়াকিন দীর্ঘকাল ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়েই বিজ্ঞানী মহলে প্রচার করেন উক্ত ভারী জলের অস্তিত্ব এবং তার চরিত্র। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এত সহজে গ্রহণ করতে পারলেন না তার আবিষ্কারকে। নানা মহলে সুরু হল নানা জল্পনা কল্পনা। প্রায় সব বিজ্ঞানীই ফেডিয়াকিনের পদ্ধতি অবলম্বনে উৎপাদন করতে এগিয়ে এলেন সেই জল। সমর্থও হলেন সবাই এবং গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে মেনে নিলেন ফেডিয়াকিনের আবিষ্কারকে।

বহু বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ায় উক্ত জলটি সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হল। কেউ কেউ অন্য উপায়েও এই ভারী জলকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। দেখা গেল, সাধারণ জল অপেক্ষা এই জল

চল্লিশ গুণের মত ভারী এবং D_2O থেকে ভারী প্রায় চার গুণের কাছাকাছি। এর সবচেয়ে বড় গুণ, একে বরফে পরিণত করা যায় না। অতি তাপমাত্রায় সাধারণ জলে বিশ্লিষ্ট হওয়ায় বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, সাধারণ জল এবং এই ভারী জলের রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে এই জল কেন এত অসম্ভব রকমের ভারী ?

এর উত্তর উক্ত ভারী জলের আবিষ্কর্তা স্বয়ং ফেডিয়াকিনই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণ জলের অণুগুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে সুসংবদ্ধ অবস্থায় নেই। যত খুশি বল প্রয়োগে জলকে সঙ্কুচিত করলে জলের অণুগুলি কাছাকাছি অবস্থান করে মাত্র। কিন্তু দৃঢ়ভাবে অণুতে অণুতে আবদ্ধ হয় না। অথচ এই যে ভারী জল, এর মধ্যে জলের তিন চারটি অণু একই সঙ্গে দৃঢ়ভাবে পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে জলের বৃহত্তম অণু বা পলিমার গঠন করে থাকে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধর, ইথিলীন নামক যৌগটি। এটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ এবং গ্যাসীয় পদার্থের নিয়ম অনুযায়ী অণুগুলির মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব থাকে। অথচ স্বাভাবিক বায়ুচাপের ত্রিশ অথবা চল্লিশ গুণ বায়ুচাপে পিষ্ট করে ক্রোমিক অক্সাইড নামক অনুঘটকের উপস্থিতিতে এবং প্রায় দেড়শ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বহু সংখ্যক ইথিলীন অণু সংযুক্ত হয়ে পলিথিন নামক সাদা কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে উৎপন্ন পলিথিন ইথিলীনের একটি পলিমার। যেহেতু ইথিলীনের রাসায়নিক সঙ্কেত $CH_2=CH_2$। n সংখ্যক $CH_2=CH_2$ অণু যুক্ত হয়ে গঠন করেছে পলিথিন। যার সঙ্কেত $(-CH_2-CH_2-)n$। অতএব, কোন যৌগের একাধিক অণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যদি উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট কোন জটিল যৌগ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয় তাহলে উক্ত প্রক্রিয়াকে বলা হয় পলিমারিজেশন এবং উৎপন্ন পদার্থটির নাম হয় পলিমার।

ফেডিয়াকিন আবিষ্কৃত ভারী জলের অণুকে তাই বলা হয় জল তথা H_2O-র একটি পলিমার। জলের এই পলিমারটির সঙ্কেত $(H_2O)_3$ বা $(H_2O)_4$। উক্ত পলিমারাইজড্ জলের অণুর সংখ্যা যত বেশি হবে ততই ঘনত্ব এবং অণুর আকার বাড়বে। অর্থাৎ জলের দুটি অণু পরস্পর দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করলে আণবিক ওজন যা হবে, তিনটি বা তারও অধিক যুক্ত হলে ওজন বেশিই হবে। চারের অধিক অণুও সংযুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করতে পারে।

জলের এই পলিমারটির বরফ না হওয়ারও কারণ ব্যক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। সাধারণ জলের ক্ষেত্রে জলের অণুগুলি পরস্পর শিথিলভাবে অবস্থান করছে। জলের তাপমাত্রাকে কমাতে কমাতে ০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নামিয়ে আনলে অণুগুলির মধ্যে শিথিলতার ভাব অনেকখানি দূরীভূত হয় এবং অণুগুলি পরস্পর সংঘবদ্ধ হওয়ার দরুণ গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। অতঃপর অণুগুলি কঠিন হয়ে সুষম স্ফটিকে রূপান্তরিত হয়।

ফেডিয়াকিন আবিষ্কৃত জলের পলিমারটি তথা ভারী জলের অণুতে তিন চারটি অণু দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার জন্য কম উত্তাপে তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। খুব কম তাপমাত্রায় অর্থাৎ—১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাকে ঠাণ্ডা করলে স্বচ্ছ ও চকচকে দেখায় মাত্র।

উক্ত ভারী জল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সেদিন যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা করেছিলেন। সবাই একমত যে, ভারী জলের পলিমার ঠিকমত তৈরি করতে পারলে বহু কল্যাণকর কর্মে ওকে নিয়োগ করা যেতে পারবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে পলিমারটি সম্বন্ধে বহু কথাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক দিকটা আজও একরকম উপেক্ষিত। প্রস্তুত কৌশলই এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। অনেকের বিশ্বাস, ওর প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হলে এবং যথেচ্ছভাবে উৎপাদন করতে সমর্থ হলে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানকে আরও উন্নত করতে পারবে

মানুষ। তবে যতদিন না ওকে ভালভাবে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন কোন কিছু বলার উপায় নেই।

সুতাকাটার কল

এক যে ছিলেন—

ভাবছো বুঝি রাজা?

না না রাজা নয়, রাজপুত্র নয়, মন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীপুত্রও নয়। তিনি ছিলেন একজন নাপিত।

হ্যাঁ নাপিত। তাঁর বাপ-ঠাকুরদা সবাই নাপিতের কাজ করে এসেছেন। ক্ষুর এবং নরুণ ধরে যা রোজগার করতেন, তাতেই দুঃখে কষ্টে চলতো সংসার। একদিন ভাবলেন তিনি, এভাবে নাপিতের কাজ করতে থাকলে চৌদ্দ পুরুষেও অবস্থার পরিবর্তন আসবে না। এক কথায় বড়লোক হতে চাইলেন তিনি।

তোমাদের বুঝি মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক ভূত কিংবা কোন দৈত্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন? অথবা পরশমণির সন্ধানে?

না না, ওসব কিছুই করলেন না তিনি। স্রেফ যন্ত্র তৈরির দিকে মন দিলেন। ভাবলেন, যন্ত্রের দ্বারা যদি বিশ জনের কাজ একা সম্পন্ন করা যায় তাহলে একের বদলে বিশ জনের রোজগার ঘরে আসবে। আবার বিশটা যন্ত্র বসিয়ে মাত্র বিশ জন লোককে মাহিনা দিয়ে নিয়োগ করতে পারলে মোট ঘরে আসবে তিনশ' আশি জনের রোজগার। দুদিনে একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাবে। হার মানাবে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকেও।

ভদ্রলোকের এমন দিবাস্বপ্নের কথা শুনে তোমরা হাসছো না তো? নাকি সেই ডিমওয়ালার কথা মনে পড়ছে? যে ডিমের

পসরা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে বিশ্রাম করছিল আর স্বপ্ন দেখছিল বড়লোক হওয়ার? তারপর দিবাস্বপ্নে এমন বিভোর হয়ে উঠেছিল যে, কাল্পনিক এক রাজকন্যাকে লাথি মারতে গিয়ে সেই ডিমের ঝুড়িকে লাথি মেরে উল্টে দিয়েছিল?

না, তেমন দিবাস্বপ্নও দেখেননি ভদ্রলোক। তাঁর পরিকল্পনা ছিল একেবারে বাস্তব। তাই নিতান্ত দরিদ্র হয়েও জগতকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রমাণ করেছিলেন, জেগে জেগে স্বপ্ন না দেখে পরিকল্পনা মত কাজ করলে এবং অধ্যবসায়ী হতে পারলে ছুনিয়ায় অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। মুঠোর মধ্যে আনা যায় কুবেরের ধনভাণ্ডারকেও।

শোন তাহলে ব্যাপারটা।

নাপিত ভদ্রলোকের মনে বড়লোক হওয়ার সাধ জেগেছিল একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আগে সেই ঘটনার কথাটাই শুনে রাখ। তারপর ধীরে সুস্থে আসা যাবে ভদ্রলোকের কথায়।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় যন্ত্রের প্রচলন বিশেষ ছিল না বললেও চলে। সবে ছু-চারজন যন্ত্রের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করছে। কেউবা ছোটখাটো ছু-একটা কিছু আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যন্ত্রের প্রতি একেবারেই উদাসীন।

ইংলণ্ডে তখন জন কে. নামে ছিলেন এক তাঁত চালক। ভাল কারিগরও ছিলেন তিনি এবং বুদ্ধিটাও ছিল ক্ষুরধার। জন কে. তাঁত চালাতেন আর মনে মনে ভাবতেন, কেমন করে কম পরিশ্রমে বেশি কাপড় প্রস্তুত করা যায়। বহুদিন ধরে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর একদিন সত্যই উদ্ভাবন করলেন এক নতুন ধরনের তাঁত। সেই তাঁতে একা তিনি দৈনিক আট দশ জন তাঁতীর সমান কাজ করতে লাগলেন। বেশ মোটা মুনাফাও লুটলেন।

কিন্তু ভদ্রলোকের কপাল ছিল বড় মন্দ। যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর কাপড় বুনছেন জানতে পেরে প্রতিবেশী তাঁতীরা মারমুখী হয়ে উঠল।

ভাবল তারা, একা জনই বাজার মাৎ করে দেবেন। তাদের আর খদ্দের পেতে হবে না। অর্থাৎ সবার জীবিকা মেরে একা জনই বড়লোক হয়ে উঠবেন। আর অন্যান্য তাঁতীদের ছেলেমেয়ের হাত ধরে পরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না।

অতএব যন্ত্রকে বরদাস্ত করতে পারল না তাঁতীরা। তারা একদিন দল বেঁধে হানা দিল জনের বাড়ীতে। ভেঙ্গে একেবারে তছনছ করে দিল তাঁর সাধের তাঁতখানা। যেখানে যত কাপড় ছিল, সব ছিঁড়ে একেবারে ফালা ফালা করে দিল। শুধু কী তাই? ঘরের আসবাব-পত্র এমন কি ঘরখানাকেও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। তারপর যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করে, আর একদফা জনকে ধমক দিয়ে গ্যাট্‌ গ্যাট্‌ করে চলে গেল। ভাবল, আর জনকে কোনদিন উঠতে হবে না। তাঁতও তৈরি করতে পারবে না কোনদিন।

বোকা তাঁতীরা বেচারা জনের তাঁতখানাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু তাঁর মন থেকে কী মুছে ফেলতে পারল যন্ত্র তৈরির কৌশলটা? বরং উল্টো ফলই ফললো। তাঁতীদের হাঙ্গামার কথা দুনিয়া রাষ্ট্র হয়ে গেল। যেখানে ছিল যত সুযোগসন্ধানী, তারা সবাই ছুটে এল জনের কাছে। ধরে বসল, ঐ নতুন তাঁত তাদের একটি করে বানিয়ে দিতে হবে। জন কে. এবার কাপড় বোনা বন্ধ করে তাঁত তৈরি করতে বসলেন। মোটা টাকাও রোজগার করলেন। যা ক্ষতি হয়েছিল, দুমাসেই তার দশগুণ টাকা ঘরে এল। দেখতে দেখতে সারা ইংলণ্ড ভরে গেল জন কে. কর্তৃক আবিষ্কৃত তাঁতে। ধনীরা আবার এক একজন দশ বিশখানা তাঁত চালাতে লাগলেন। বস্ত্রশিল্পে এক বিপ্লব সূচিত হল।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আর একটি সমস্যারও উদ্ভব হল। সারা দেশ তো যন্ত্রে ছেয়ে গেল, এত সূতা আসবে কোত্থেকে? বেশি সূতা কাটা যেতে পারে—এমন যন্ত্র তো আবিষ্কৃত হয়নি! খালি হাতে একজন মানুষ সারাদিনে কত আর সূতা কাটবে? একটা তাঁতে ঠিক মত

কাপড় উৎপাদন করতে গেলে যে একশ' জনকে সূতা কাটার জন্য নিয়োগ করতে হয়?

অতএব চাই সূতা, চাই সূতা! হাহাকার পড়ে গেল দেশে। বহু তাঁত বন্ধ হওয়ারও উপক্রম হল। কেউ কেউ আবার সূতার চাহিদা মেটাবার জন্য গবেষণায়ও মেতে উঠলেন। তাঁদের ইচ্ছা, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে একগাছার বদলে পাঁচ সাত গাছা সূতা বার করবেন!

আমাদের সেই ভদ্রলোককেও পেয়ে বসল একই চিন্তা। নাপিতের কাজে তাঁকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হত। দেখলেন, সব জায়গায় তাঁতীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। সূতার অভাবে তাঁত আর চলছে না। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা তাঁর মাথায় এসে গেল। নতুন তাঁত যেমন দশজনের কাজ একা করছে, তেমনই এমন এক যন্ত্র কী আবিষ্কার করা যায় না—যার দ্বারা দশজনের সমান সূতা উৎপন্ন করা যাবে?

তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক লেগে গেলেন কাজে। নাপিতের কাজ মাথায় উঠল। রাতদিন কেবল কাটাকাটি, ঠুকঠাক। ভদ্রলোকের আবার আর্থিক সঙ্গতি ভাল না থাকায় যন্ত্রপাতি কিনতে পয়সাও পেলেন না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিজের হাতেই তৈরি করতে হল। অন্যদিকে ঘরেও দেখা দিল অভাব। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে প্রতিদিন জানাতে লাগল নানা অভিযোগ। কিন্তু ভদ্রলোক রইলেন একেবারে নির্বিকার হয়ে।

কিছুদিন চললো এইভাবে। তারপর সংসারে অভাব যখন চরমে উঠল তখন ভদ্রলোকের স্ত্রী একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। গরীবের ঘোড়া রোগকে বরদাস্ত করতে পারলেন না তিনি। প্রথমে হল চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ, তার পর আরম্ভ করলেন ঝগড়া। কিন্তু ফল মোটেই ভাল হল না। নাপিত ভদ্রলোক যেন কানে তুলা গুঁজে আপন মনে করাত বাটালি চালাতে থাকেন। একটি কথাও বলেন না।

স্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ভাবলেন, যত নষ্টের মূল ঐ যন্ত্রপাতিগুলো। এদের নষ্ট করে ফেললে ভদ্রলোক পুনরায় কাজ করতে বেরিয়ে যাবেন আর সংসারেরও অভাব মিটবে। তাই একদিন একেবারে মারমুখী হয়ে ঘরে ঢুকলেন ভদ্রমহিলা। চোখের সামনে যা পেলেন তাকেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন।

স্ত্রীর কাণ্ড দেখে ভদ্রলোকের বাক্যস্ফূর্তি হল না। কেবল বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর ভাঙ্গা যন্ত্রপাতির দিকে। বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সেইদিন রাত্রিতেই ভদ্রলোক ঘর ছাড়লেন। অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি হাতে করে উঠে এলেন বহুদিনের পরিত্যক্ত এক স্কুল বাড়িতে। স্থানে স্থানে কড়ি বরগা ঝুলে পড়েছে। দাঁত বার করে হাসছে ইটগুলো। এখানে ওখানে আগাছায় ভর্তি। যাকে বলে এক্কেবারে পোড়ো বাড়ি। ওর ত্রিসীমানায় মানুষ ভুলেও পা বাড়ায় না।

ভদ্রলোক ভাবলেন, সাধনার এমন নির্জন ক্ষেত্র পৃথিবীতে বোধ করি দ্বিতীয় নেই। অতএব পেতে বসলেন তাঁর যন্ত্রপাতি। আবার ঠুকঠাক, ঘষাঘষি। সেই শব্দ সুনির্জ্জন স্কুল ঘরের ভাঙ্গা দেওয়াল-গুলিতে প্রতিহত হয়ে অপার্থিব কোন চেঁচামেচির মত ছড়িয়ে পড়ল পার্শ্ববর্তী লোকালয়গুলিতে।

ভদ্রলোকের স্ত্রী এখানেও এসে হানা দিলেন। তবে যন্ত্রপাতি আর ভাঙ্গলেন না। শুধু কাকুতি মিনতি করে জানালেন, সংসার আর চলছে না। এইভাবে চলতে থাকলে একদিন উপোস করে সবাইকে মারা যেতে হবে। তখন কোন্ কাজে লাগবে যন্ত্র ?

ভদ্রলোক এবার যেন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। স্ত্রীর কথা মত দিনের বেলায় নাপিতের কাজ করতে আরম্ভ করলেন আর সন্ধ্যা হলেই ছুটে যেতেন সেই স্কুল ঘরে। সারারাত ধরে চলতো তাঁর কাজ।

দিন যায়। ভদ্রলোকের অধ্যবসায় দেখে একদিন সুপ্রসন্না

হলেন ভাগ্যলক্ষ্মী। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রবল থেকে প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। বুঝতে পেরেছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জগৎকে উপহার দিতে পারবেন এমন এক যন্ত্র, যা এখনও অনেকের কল্পনার বাইরে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ভদ্রলোকের। ঠিক সেই সময় ঘটল এক অঘটন। রাতেই তিনি কাজ করতেন। উদ্ভাবিত তাঁর যন্ত্রকে চালাতে গেলে উঠত বিকট সব আওয়াজ। কখনও ঘড় ঘড়, কখনও বা গোঙানির শব্দ। স্কুলের আশেপাশে যাদের ঘর ছিল, তারা ভদ্রলোকের কাণ্ড কারখানা দেখে একেবারে আঁতকে উঠল। যন্ত্রের সঙ্গে তখনও মানুষের পরিচয় হয়নি বলা চলে। প্রতি রাতে বীভৎস সব শব্দ শুনতে শুনতে প্রতিবেশীদের ধারণা হল, ভদ্রলোক পিশাচসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তা না হলে রাতে ঐ পোড়ো বাড়িটার ভেতরে কী করেন ভদ্রলোক? রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কেমন করে বেঁচে আছেন? ঐ যে অপার্থিব চিৎকার! নিশ্চয়ই রাতে চারদিক থেকে প্রেতাত্মারা ছুটে আসে ভদ্রলোকের কাছে।

প্রেতাত্মাদের ভয়ে প্রতিবেশীদের রাতের ঘুম গেল ছুটে। মহা বিপদের কথা! যদি ভূতেরা তাদের ঘরে হানা দেয়? ছেলেপুলে নিয়ে সংসার! তার উপর রাতবিরেতে কাজের জন্য মাঝে মাঝে অনেককে বেরুতেও হয়। তখন যদি কোন প্রেতাত্মার সম্মুখীন হয়, তাহলে কী উপায় থাকবে? সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় মটকে দেবে না?

মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল প্রতিবেশীরা। ভাবল, ভদ্রলোককে এখান থেকে না তাড়ালে রক্ষা পাওয়া যাবে না। সবাইকে ভূতের কবলে প্রাণ দিতে হবে। গোপনে গোপনে চললো শলা-পরামর্শ। তারপর একদিন সবাই মিলে হানা দিল স্কুল ঘরে। আর যন্ত্রপাতিগুলোকে ভেঙ্গে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

ভদ্রলোক তখন স্কুল ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। সন্ধ্যায় এসে

দেখলেন, একেবারে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার! ততদিনে অনেকটা তিনি এগিয়ে গেছিলেন। তখন সবেমাত্র বেরুতে সুরু করেছে একগাছার বদলে বেশ কয়েকগাছা সূতা। তবু আরও উন্নত করতে চেয়েছিলেন তাঁর যন্ত্রকে। কিন্তু একি হল? ভদ্রলোকের চোখ ফেটে জল এল।

সারারাত ধরে বসে বসে কেবল ভাবলেন তিনি। কিন্তু এবারও ধৈর্য হারালেন না। ভাবলেন, ভাল কাজে বাধা বেশিই আসে। তাই পরদিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন অনেক দূরে। লোকালয়ের নাম গন্ধ নেই। পথচারীরা কালে-ভদ্রে আসে ওদিকে। একেবারে পছন্দসই জায়গা।

এবার নাপিতের কাজ বন্ধ করে দিলেন তিনি। পুনরায় লেগে গেলেন যন্ত্র তৈরির কাছে। খুব বেশি আর বেগ পেতে হল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এল একসঙ্গে পাঁচ সাত গাছি করে সূতা। হাত দিয়েও যন্ত্র ঘোরাতে হল না। জলস্রোতকে কাজে লাগিয়ে এক অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কার করলেন। নামকরণ করলেন ওয়াটার ফ্রেম।

সেদিনের সেই নাপিত ভদ্রলোকের নাম রিচার্ড আর্করাইট (১৭৩২-১৭৯২)। অতি অল্পদিনের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন মহান এক আবিষ্কারক রূপে। সেই সঙ্গেই তাঁর আবিষ্কৃত ওয়াটার ফ্রেম এবং সূতাকাটার যন্ত্রকে লুফে নিয়েছিল লণ্ডনের বড় বড় শিল্পপতিরা। যন্ত্রের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আর্করাইটকে খুলতে হয়েছিল বিরাট এক কারখানা। আর এমনই ভাগ্য, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন লণ্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীরূপে। তাঁর ওয়াটার ফ্রেম হার মানিয়েছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকে। অর্থ এবং সম্মান দুইই লাভ করেছিলেন আর্করাইট! লেখাপড়া তাঁর এমন কিছু ছিল না। অথচ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের অন্যতম তিনি। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একজন আবিষ্কর্তার করুণ কাহিনীও উল্লেখ করতে হয়। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন "মিউল" নামে সুতা কাটার আর এক ধরনের যন্ত্র। যন্ত্রটি এককালে ইংলণ্ডে যথেষ্ট সমাদরও লাভ করেছিল। এমনকি আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেমকে বাদ দিয়ে লোকে কিনতো মিউল। ওয়াটার ফ্রেম অপেক্ষা মিউলের সুবিধা থাকায় ওর চাহিদা এত বেড়ে গেছিল যে পৃথক কারখানাও স্থাপন করতে হয়েছিল। কিন্তু আবিষ্কর্তার ভাগ্যে কানাকড়িও জোটেনি। আজীবন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন, কতদিন কাটিয়েছেন অনাহারে। অথচ তাঁরই তৈরি যন্ত্রের দ্বারা কত লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছে।

মিউলের আবিষ্কর্তার নাম স্যামুয়েল ক্রোম্পটন। আর্করাইটের মত তিনিও ছিলেন দরিদ্র। তাঁকেও আবিষ্কারের নেশা এমন পেয়ে বসেছিল যে, রোজগারের কথা চিন্তা না করে সারাটা জীবন কেবল গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন। আবিষ্কারও করেছিলেন। তবে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় কেউ আর তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে আসেনি। শিল্পপতিরাই কারখানা খুলে বসেছিল। আর বেচারা ক্রোম্পটন! নিজের তৈরি মিউলে কেবল বাকী জীবনটা সুতা কেটেই কাটিয়ে গেছেন। কপালের লিখনটি হাজার চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারেননি। শুধু লাভ করেছিলেন আবিষ্কারকের গৌরব। যদিও বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন ঘটনা বিরল নয়। বহু মহান আবিষ্কর্তাকে সারাজীবন দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হতে হয়েছে।

আদিকালে ছাপার কাজ

রাজা মন্ত্রীর গপ্পো না হলে তোমাদের মন বিশেষ ভরে না। তাই অনেক খুঁজে পেতে ধরে আনা হল পাকা দাড়িওয়ালা এক মন্ত্রীমশাইকে।

বুঝি মনে মনে ভাবছো, মন্ত্রীমশাইরা তো রাজ্য পরিচালনা করেন —বিজ্ঞানের খোঁজ খবর রাখেন কতটুকু? কূটবুদ্ধিতেই তাঁরা পাকা।

কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো আর সমান নয়। তাই মন্ত্রীও বিজ্ঞানী হতে পারেন। তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পড়ো এই গপ্পোটাকে।

অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। প্রায় হাজার বছরেরও বেশী। তখন চীনদেশে রাজত্ব করতেন এক তরুণ ও খামখেয়ালি রাজা। সব রাজার মত তাঁরও ছিলেন এক মন্ত্রী। যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বিচক্ষণ। এমন যে খেয়ালি রাজা, তাঁকেও বুদ্ধিবলে ঠিক পথে চালিয়ে নিতেন। প্রজারাও বেশ সুখে শান্তিতে বাস করতো।

খেয়ালি রাজার মাথায় অনেক সময় নানা খেয়াল ভর করতো। যখন তখন প্রজাদের মধ্যে বিলি করতে হত তাঁর নির্দেশনামা। কাগজে ভাল করে লিখে মন্দির গাত্রে, পথের পাশে গাছের ডালে, চৌরাস্তার মোড়গুলিতে, হাটে-বাজারে সর্বত্র ঝুলিয়ে দিতে হত। তার জন্য একদল লিখিয়েও ছিল।

কিন্তু রাজা এমন খুঁতখুঁতে ছিলেন যে, অনেক সময় কোন লেখাই তাঁর পছন্দ হত না। বারে বারে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বলতেন, জলের মত কেবল পয়সাগুলোই খরচ হচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

বুড়ো মন্ত্রীমশাই মাঝে মাঝে বড় ফাঁপরে পড়তেন। সব সময় রাজার কাছাকাছি থাকতে হত বলে বেশিরভাগ বকুনি তাঁকেই হজম

করতে হত। কিন্তু কী আর করবেন! উল্টে রাজাকে তো আর বকাঝকা করা যায় না।

একদিনের এক ঘটনা। রাজার নির্দেশনামাকে ভাল করে কয়েকখানা কাগজে কয়েকজন লিখিয়ের কাছ থেকে লিখিয়ে এনে মন্ত্রীমশাই স্বয়ং হাজির হলেন রাজার সামনে। বললেন, "লেখাগুলো দয়া করে একটু দেখে দস্তখৎ করে দিন মহারাজ! এক্ষুণি প্রজাদের অবগতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

রাজা লেখাগুলোকে হাতে নিয়ে খুব করে দেখলেন। তারপর চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঝরাতে ঝরাতে ছুঁড়ে মারলেন একেবারে মন্ত্রীমশাইর মুখের উপর। চিৎকার করে বললেন—

—এমন বাজে লেখার নিচে আমি দস্তখৎ করব না। ভাল করে লিখে আনুন! মুখটা ব্যাজার করে মন্ত্রীমশাই চলে গেলেন। বার বার ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মন্ত্রী চিন্তা করলেন অনেকক্ষণ। তারপর ডাকলেন রাজ্যের ভাল ভাল লিখিয়েদের। সবার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন হস্তাক্ষরের নমুনা। খুব করে পরীক্ষা করার পর একজনের লেখা বেশ ভাল লাগল মন্ত্রীমশাইর। তখন সেই নমুনাটাকে নিয়েই ছুটলেন রাজার কাছে। বললেন—রাজ্যে যত লিখিয়ে আছে, তাদের মধ্যে ঐ একজনের লেখাই ভাল। অনুগ্রহ করে যদি অনুমোদন করেন, তাহলে এক্ষুণি ওকে বহাল করি।

রাজা বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন লেখাটিকে। তারপর একসময় বললেন—হুঁ, চলবে।

হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন মন্ত্রীমশাই। পরক্ষণে অসুবিধা বড় কম অনুভব করলেন না। দৈনিক এত নির্দেশ একজন মানুষ লিখবে কেমন করে? তাও আবার একটা নির্দেশকে একখানা কাগজে লিখলে চলবে না। গণ্ডা গণ্ডা প্রতিলিপি করতে হবে! কোনগুলি আবার খারাপ হওয়া চলবে না!

সেদিন সেই লিখিয়েকে দিয়ে তাড়াহুড়া করে কোন রকমে কাজ শেষ করলেন। তারপর সারারাত ধরে কেবল ভেবেই চললেন। ভোর হতেই পুবের আকাশটার মত রাশি রাশি চিন্তার জট খুলে গিয়ে মাথাটা একেবারে ফর্সা হয়ে উঠল। উত্তেজনায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। বেতো শরীরের হাড়গুলো একবার ঝনঝন করে বেজে উঠে চুপ করে গেল। মন্ত্রীমশাই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তৎক্ষণাৎ হাঁক ডাক সুরু করলেন।

চাকর বাকর ভোরের ঘুমের আমেজটা চুটিয়ে ভোগ করছিল। মন্ত্রীমশাইর বাজখাঁই গলা শুনে ধড়ফড় করে উঠে ছুটে এল কাছে। তাদের একটা ধমক দিয়েই মন্ত্রীমশাই একজনকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন রাজ্যের বুড়ো ছুতার মিস্ত্রীর কাছে।

মিস্ত্রী সবেমাত্র হাতমুখ ধুয়ে কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মন্ত্রীমশাইর তলব শুনে পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন। কোন ভূমিকা না করেই মন্ত্রীমশাই হাতের কাগজখানা বুড়ো মিস্ত্রীর সামনে পেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পারবে, এই লেখাটাকে কাঠের উপর খোদাই করে দিতে ?

মিস্ত্রী বললেন।—এ আর কী এমন শক্ত কাজ ? নরম কাঠ হলে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

মন্ত্রীমশাই বললেন।—দেরি নয়, এক্ষুণি লেগে যাও কাজে।

সত্য সত্যই ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে লেখাটাকে কাঠের ফলকে খোদাই করে ফেললেন বুড়ো মিস্ত্রী। মন্ত্রীমশাই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ফলকের উপর কালি মাখিয়ে চেপে ধরলেন একটা কাগজের উপর। কিন্তু ফল দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন মন্ত্রীমশাই। লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো।

পুনরায় চিন্তা আরম্ভ হল মন্ত্রীমশাইর। তবে এবার আর বেশী ভাবতে হল না। মিস্ত্রীকে বললেন—অন্য একটা কাঠের ফলকে ঐ উল্টো লেখাটাকে তাড়াতাড়ি খুদে ফেল দিকিনি।

—"যে আজ্ঞে" বলে বুড়ো মিস্ত্রী পুনরায় আরম্ভ করলেন কাজ। এবারও সময় লাগল কয়েক ঘণ্টা। মন্ত্রীমশাই আবার ঐ উল্টো লেখা ফলকের উপর কালি চাপিয়ে কাগজে দিলেন ছাপ। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। হুবহু সেই ভাল লিখিয়ের হাতের লেখা!

সেইদিন থেকে সেই লিখিয়ে এবং সেই বুড়ো ছুতার মিস্ত্রী পাকাপোক্তভাবে বহাল হলেন রাজবাড়ীতে। রাজার নির্দেশকে উল্টো করে লিখিয়ে লিখে দিত কাগজে আর মিস্ত্রী সেই উল্টো লেখাটাকে চটপট খোদাই করে ফেলতেন কাঠের ফলকে। এক ঘণ্টায় শ' শ' কাগজে নির্দেশ কিংবা হুকুমনামা ছাপা হয়ে যেত।

দিন যায়। বুড়ো মন্ত্রী একদিন ভাবলেন, এত কষ্ট না করে যদি এক একটা অক্ষরকে তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে সব সময় মিস্ত্রীর এবং লিখিয়েরও দরকার হবে না। যে কেউ অক্ষরগুলোকে কাঠের ফলকে সাজিয়ে ছাপ দিতে পারবে। তাতে কাঠের খরচও কমবে।

আবার আরম্ভ হল কাজ। মন্ত্রীর নির্দেশে বুড়ো মিস্ত্রী মাটি দিয়েই তৈরি করে নিলেন সব অক্ষর। তারপর সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেললেন। বড় বড় কাঠের ফালি আগে থেকেই তৈরি ছিল। রাজার হুকুমনামা অনুযায়ী কাঠের ফলকের উপর অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে ভালভাবে আঠা দিয়ে আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। অবশেষে কালি মাখিয়ে ছাপ দিতে একই ফল পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, মাটির অক্ষর মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যেত বলে তাঁকে একই অক্ষর দশ বিশটা করে তৈরি করতে হয়েছিল।

কাজের এবার অনেক সুবিধা হল। সময়ও বেঁচে গেল অনেক। রাজবাড়ীর কাগজপত্র ও হিসাব-নিকাশকে পাকা করে লেখার জন্যও গ্রহণ করা হল এই পদ্ধতি। আর ছাপার কাজ পৃথিবীতে প্রথম সুরু করল চীন দেশ।

চীন দেশের সেই রাজার নাম কিন্তু জানা যায় না। তবে সেই

বুদ্ধিমান মন্ত্রীমশাইর নাম ছিল ফুং তে। আর যে ছুতার মিস্ত্রী অক্ষর বানিয়েছিলেন তার নাম পী চিং। কথিত আছে, এই পদ্ধতিতে চীনারা বহু বৌদ্ধ পুঁথিকে ছাপিয়েছিল। তার নমুনা এখনও কোন কোন বৌদ্ধ বিহার এবং সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। চীনারা সে সময় বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল তার একটা বড় প্রমাণ তাদের তৈরি কাগজ এবং ছাপানর কাজ।

কালক্রমে ঐ ছাপার পদ্ধতি কিন্তু লোপ পেয়ে যায় চীন থেকে। পরবর্তী রাজা এবং রাজপুরুষদের ছাপার প্রতি অনাগ্রহই ছিল এর মূল কারণ। এমনকি পী চিং কষ্ট করে যে অক্ষরগুলো তৈরি করেছিলেন সেগুলিকে তাঁর ছেলেরা আবর্জনা মনে করে ফেলে দিয়েছিল। আজকের মত সেদিন কোন ছাপাখানা গড়ে না ওঠারও পদ্ধতিটি লুপ্ত হওয়ার আর এক কারণ ছিল।

চীন দেশে এই ঘটনাটি ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তার প্রায় ছ-সাতশ' বছর পরে ইওরোপেই প্রথম চালু হয় ছাপার কাজ। আর প্রথম ছাপা হয়েছিল তাস এবং ছবির বই। অবশেষে গুটেনবার্গের প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে প্রথম স্থাপিত হয় মুদ্রণ যন্ত্র। কথিত আছে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুটেনবার্গ এবং তার সহকর্মীরা ধাতব টাইপ তৈরি করেন। সেই টাইপকে কাঠের ফলকে সাজিয়ে এবং তাতে কালি মাখিয়ে, এক ধরনের হস্তচালিত যন্ত্রে চাপ দিয়ে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেল ছেপেছিলেন। উক্ত ঘটনার পর প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে ছাপার কাজ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইওরোপে। সে আর এক কাহিনী।
